# সপ্তসিন্ধু

রাহুল সাংকৃত্যায়ণ

অনুবাদঃ শ্রীভগীরথ

চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানী
১২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৬

অনুবাদকের অধিকার সীমিত।
সেই সীমিত অধিকারের ঔদ্ধত্যে
নিতান্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে
রাহুলজীর উপযুক্ত
সহধর্মীণী
শ্রীমতী কমলা সাংকৃত্যায়ণ
এম. এ., পি-এইচ-ডি—
যাঁর বিস্ময়কর
মধুর ব্যক্তিত্বে
মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না—
তাঁরই উদ্দেশ্যে
গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা॥

## ॥ কয়েকটি কথা ॥

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণের এই নবীনতম উপন্যাস ঋগ্বেদিক কালের ঘটনার উপর আধারিত। সেই যুগের সজীব চিত্রণ এই উপন্যাসে যেমনভাবে করা হয়েছে তা অন্যত্র দুর্লভ বলা যায়। ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত পৃষ্ঠা মহাপণ্ডিতের কল্পনায় সজীব রূপ নিয়ে পাঠকের সামনে একের পর এক উপস্থিত হয়েছে। এই উপন্যাস শুধু হিন্দী সাহিত্যে নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে একক এবং নিজস্ব রূপ, রস, গন্ধে, বর্ণে অতুলনীয়। বৈদিক যুগের উপর আধারিত এমন উপন্যাস আর আছে বলে আমার জানা নেই। আশা করি এ উপন্যাস ভারতীয় সাহিত্য-জগতে উপযুক্ত আদর পাবে।

বঙ্গানুবাদের ভুলত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা পাব আশা করি। এই উপন্যাসে সার্থকতার সবটুকু কৃতিত্ব মহাপণ্ডিত রাহুলজীর। এই বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে যাঁরা সক্রিয় সাহায্য করেছেন সেই শ্রীপরেশ চক্রবর্তী ও শ্রীবারীন মিত্র মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

—শ্রীভগীরথ

## ॥ এক ॥

"সপ্ত যত পুরঃ শর্ম শারদীর্দর্দত দাসীঃ"

[ খৃঃ পূঃ ১২২০ ]

সপ্তসিন্ধুর গরম যেন অসহ্য ওখানকার শরৎকালটাও তেমনি কড়া। তবে ওখানকার অধিবাসীরা একে খুব উপভোগ করে থাকে। যদিও সপ্তসিন্ধুর আর্যজাতির কাছে জীবনকে ভোগ করবার প্রচুর সময় থাকে।

কৃষিকাজ করে শুধু কিছু যব সংগ্রহ করতে পারলেই হল। তাই দিয়ে ছাতু এবং রুটি তৈরী হবে। বাকী সবকিছু নির্ভর করে পশু আর প্রকৃতির উপর।

এই সকল আর্যদের আসল জীবিকা ছিল পশুপালন। তাই যদি ওরা কখনো কিছু প্রার্থনা করত তাহলে বলত,—কল্যাণ হোক আমাদের গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া আর নর-নারীর। (ঋক্ ১।৪৫।৬)

এরা নিজেরাই পশুপালন করত। রাজা আর এদের মধ্যে পার্থক্য ছিল মাত্র পশু সংখ্যার কমবেশি।

যেখানে এদের দু-পাঁচ শ, সেখানে রাজার হবে দু-পাঁচ হাজার।

পণি নামক জাতির এই সমৃদ্ধ জনপদ আর্যরা তিন শতাব্দী আগে জয় করেছিল। আজও তারাই রাজত্ব করছে।

এখানকার আর্যরা নাগরিক জীবনকে তেমন পছন্দ করত না। জীবনকে ভোগ করবার জন্য বিশাল অরণ্য আর খোলা মাঠ রয়েছে। এই আরণ্য জীবনকে তারা পছন্দ করত সবচেয়ে বেশি।

তাই পারতপক্ষে ওরা নগরে এসে বাস করতে চাইত না। এমন কি গ্রামের মায়াও ওদের বাঁধতে পারেনি।

যদিও এ সময়ে গ্রাম অর্থে একটা দলের বাসস্থান ছাড়া আর কিছু বোঝাত না।

চাষের জমির পাশে যদিও থাকবার মত কিছু ঘর তৈরী থাকত, কিন্তু ঘরে বাস করতে গেলে পশুপালন হয় না। তাই এগুলি নেহাত কালে-ভদ্রে ব্যবহৃত হত।

বর্ষাকাল ওদের কাছে সবচেয়ে কষ্ট এবং ভয়ের সময় ছিল। কারণ এই সময় শুধু সপ্তসিন্ধুই নয়, নব্বুই স্রোতা ( ছোট নদী ) এবং হাজার হাজার খাল, ডোবা, নালা জলে ডুবে যেত। আর্যদের বাড়ীঘর ডুবে যেত, ভেসে যেত। অবশ্য বাড়ী ঘরের জন্য তাদের তেমন চিন্তা ছিল না। চিন্তা ছিল হঠাৎ জলের স্রোত এসে তাদের পশুদের বিনাশ না করে।

আর্য পুরোহিতরা ইন্দ্র আর সূর্যের স্তুতি করত। তাঁদের জন্য সোম এবং হোম তৈরী করত। ভক্তিভরে প্রার্থনা করত। কিন্তু দেবতা কখনো কারো বশ মানে না। তবুও ভক্তি ও ভক্তের শেষ নেই।

কোথাও যদি বরষার দানে চারিদিক সবুজ-শ্যামল ঘাসে পূর্ণ হয়েছে, মনের আনন্দে সেখানে পশুরা চরে বেড়াচ্ছে। দেখে ওরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলছে। আবার কোথাও বরুনদেবের রক্তচক্ষুর রোষে সর্বদা মনের উপর চিন্তার পাহাড় চেপে থাকে যেন। না জানি তাঁর কোন ইশারায় নদী নালা সব একাকার হয়ে গিয়ে বিপত্তি ডেকে আনবে।

গ্রীষ্মকালে অবশ্য তেমন ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু শেষের দুটো মাস অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠতো। পশমী আর চামড়ার পোষাকে তখন বিরক্ত লাগত। গলদঘর্ম হয়ে বাধ্য হতো তাকে ত্যাগ করতে।

কখনো ইচ্ছে হত একেবারে নগ্ন হবার।

কিন্তু সমাজ তা পছন্দ করত না।

শরতকাল ওদের কাছে খুব প্রিয় ছিল। তাই প্রার্থনার সময় ওরা বলত "আমি" বা "অমুক" যেন শত শরত পরমায়ু পায়।

সারা বছর ওরা ঘুরে ঘুরে শরতকাল কাটাবার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজত। সেখানে পশুগুলির শান্তিতে খেয়ে দেয়ে বিচরণ করবার সুবিধা ছিল। ওদের সঙ্গে পশুরাও শরতঋতু ভোগ করতো মনের আনন্দে।

আর্যদের জন-এর সংখ্যা এখন পাঁচ থেকে পঁচিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও মূল যে পাঁচ ঘর, যথা—পুরু, যদু, দ্রুহ্য, অনুদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল বেশি। শক্তিতেও তারা অজেয় ছিল।

পুরু জাতির জনপদ সপ্তসিন্ধুর পূর্বদিকে পরুষ্ণী ( রাবী ) নদী থেকে স্বরস্বতী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওদিকে ওদের কতকগুলি শাখা-জাতি সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে কুশিক, ভরত, তৃৎসু প্রভৃতি প্রধান। এদের মধ্যেও পুরু জন-এর সম্মান বেশি ছিল। এদের নেতা ( রাজা )-কে সকলে খুব আদর করত। সকল আর্যরাজা ও রাজকুমারদের মধ্যে এদের সমাদর ছিল সকলের অধিক।

পুরু রাজবংশ নির্ভীকতা এবং বীরত্বে সকলের আগে ছিল। প্রত্যেক পুরুরাজা তার জীবনে এমন একটি বীরত্বপূর্ণ কাজ করত যাতে প্রমাণ হত যে পুরুরাজবংশের বীরত্বে ভাটা পড়েনি।

সপ্তসিন্ধুর পূবদিকে পুরুজাতির বসবাস ছিল। এখানে যমুনার অপর পারে এখনো কালো জাতির অসুরদের ( কালো বর্ণের জাতি ) রাজত্ব রয়েছে। তারও উত্তর দিকে দুর্দান্ত কিলাত জাতির বাস।

অতএব সংঘর্ষের অবসরের অভাব ছিল না। তাছাড়া এদের তামার অস্ত্রের জন্য এদের নিজেদের শক্তির উপর আস্থা ছিল খুব।

ঘগ্‌ঘর ( দৃষদ্বতী ) নদীর দুইদিকের চরে সবুজ ঘাসের খোলা

মাঠ। ঘাস যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে ঘন অরণ্য। এমনি ফলন্ত জমি দেখে পণি জাতির লোক চাষের স্বপ্ন দেখত। কিন্তু পশুপালকের কাছে চাষের জমির চেয়ে গোচারণ ভূমির আদর বেশি।

এমনি বিরাট ঘাসের মাঠে চারিদিকে বড় বড় শিংওয়ালা গরু, বলদ প্রভৃতি পশু দলে দলে চরে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে রয়েছে বহু ঘোড়া। এরাও চরছে। ঘোড়াগুলির গায়ের রং কারো বা দুধের মত সাদা, আর কারো বা লাল। এদের সুন্দর স্বাস্থ্য আর রঙের জন্য স্বামীর কাছে এরা খুব প্রিয়।

বর্ষার সময় দৃষদ্বতী নদীর স্রোত প্রলয় রূপ ধারণ করলেও এখন সে ভয় নেই। এখন শরতকাল। নদীতে ততটুকু জল আছে যতটুকুতে এই মানুষ ও পশুর অসুবিধা হয় না। এই জলধারার পাশে সারিবদ্ধভাবে কতকগুলি ঘর দেখা যাচ্ছে। হালফিল এই ঘরগুলি তৈরী হয়েছে। জঙ্গলের কাঠ আর লতা-পাতা দিয়ে তৈরী এগুলি। রাত্রে জঙ্গলের সিংহ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। নদীর দিক ছেড়ে বাকী তিনদিকে কাঠের ঘেরা। এখান থেকে আরো খানিকটা দূরে গিয়ে ঘগ্‌ঘর নদীতে শুধু নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছু নেই। এখানে ওর নামের সার্থকতা হয়েছে। সেখান থেকে বিরাট উঁচু পাহাড়ের সারি বেশি দূর নয়।

এখানকার পশুদের সংখ্যা আর বিশাল গ্রাম দেখলে স্বভাবতই মনে হয় এ গ্রাম অসাধারণ কোনো আর্যকুলের নিশ্চয়।

বস্তুতঃ এখানে পুরুকুলের রাজা পুরুকুৎস থাকবার জন্য এসেছেন।

পণি :—( সং ) হাট, বাজার। এখানে ব্যবসায়ী এবং পশুপালক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ( নালন্দা বিশাল শব্দকোষ পৃষ্ঠা—৭৭১ ) ( পণ্যদ্রব্যের লেনদেনকারী )

যেহেতু পুরুকুলপতি, তাই তাঁর সঙ্গে এত অধিক সংখ্যক মানুষ ও পশু থাকা অসম্ভব নয়। এই অস্থায়ী গ্রামে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীর সংখ্যা খুবই কম। আর্য তরুণরা দাড়ী-গোঁফ পছন্দ করে না বটে কিন্তু বয়সটা মাঝামাঝি হলেই দাড়ী রাখতে সকলে যেন গর্ব অনুভব করে। কারও কারও সোনালী গোঁফ-এর উপর বেশ নজর রাখতে দেখা যায়। একজন প্রৌঢ় আর্যনেতা দাড়ীর উপকারিতার কথা স্বীকার করে বলে,—যে আন্দাজে আমার দেহটা বেঁটে তাতে যদি দাড়ী না থাকত তাহলে লোকে আমাকে কিলাত বলত। প্রৌঢ় আর্যদের দাড়ীপ্রীতির এইটা হয়ত আর একটা বিশেষ কারণ হতে পারে। তাছাড়া দাড়ী রাখলে নিত্য ক্ষৌরকর্মের ঝামেলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেকে বলে,—এ বয়সে ত আর কোনো সুন্দরী তরুণী আমাকে দেখে ভুলবে না।

যদিও পুরুগ্রাম স্থায়ী গ্রাম নয় তবুও মানুষ এবং পশুর যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। তাই সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সারিতে ঘর বাঁধা হয়েছে। পশুশালার ঘরগুলি খুব লম্বা ও সারিবদ্ধ। প্রথম সারিতে ঘোড়া, তারপর গরু, ভেড়া প্রভৃতি।

সন্ধ্যার অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের যার যার নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুধের গরু ছাড়া সকলকে জঙ্গলের দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়।

রাতের অন্ধকার কত না অজানার ভয়ের বাহন হয়ে থাকে। তাই সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উষার আলোর জন্য প্রতীক্ষা করে। মানুষ শত্রু যে কোন সময়ে এসে হামলা করবে তার ঠিক নেই। তাছাড়া ঘগ্‌ঘরা নদীর তটে অসংখ্য ভূত প্রেত ঘোরাঘুরি করে। তাই রাত্রিবেলা কোনো আর্যযোদ্ধা শুধু হাতে ঘেরার বাইরে যেতে সাহস করেনা।

কাঠের ঘেরা পুরুনগরী বা কেল্লার মধ্যে সর্বত্র জীবনের উচ্ছলতা বিদ্যমান। সেই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীরা ঘর কন্নার ভার সামলাতে ব্যস্ত, আর পুরুষের মধ্যে কেউ পশু নিয়ে মাঠের দিকে যাত্রা করে নয় ত কেউ তাদের থাকবার ঘরগুলি পরিষ্কার করবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়। তরুণরা সকালেই কসরত করতে নেমে পড়ে। মল্লযুদ্ধই সবচেয়ে প্রচলিত ব্যায়াম। সকলেই চায় তার সুপুষ্ট শরীর সম্পত্তিকে আরো খানিকটা বাড়িয়ে নেয়। তাই আর্যদের প্রত্যেক গ্রামে ভোর থেকে আখড়ায় ভীড় জমে ওঠে। আর্যদের কাছে নির্বল দেহ মৃতের তুল্য। এরা স্বভাবতঃ দীর্ঘদেহী হয়ে থাকে। তাই কিলাত ও পণি জাতির লোকেরা এদের কাছে দাঁড়ালে শিশু বলে মনে হয়। চওড়া বুকের ছাতি, মোটা গ্রীবা, উঁচু কাঁধ আর মজবুত কব্জির সম্মান সবচেয়ে আগে।

এই গ্রামে দশ-বারোটা আখড়া রয়েছে। ভোর হতে সকল তরুণরা আসে শরীর চর্চা করতে। শিক্ষিত প্রৌঢ়রা আসে তরুণদের কৌশল শেখাতে।

পুরুরাজ স্বয়ং একজন পাকা মল্লবীর। বয়স ২৫।২৬এর বেশি নয়। তার মাখনের মত মোলায়েম আর সাদা মুখের ঈষৎ আলতা রাঙা আভা দেখলে যে কেউ বলতে পারে এ নিশ্চয় এক অসাধারণ পুরুষ।

রাজা পুরুকুৎস নিশ্চয় অসাধারণ।

অসাধারণ কুলে তার জন্ম। হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়ালে সহজেই চিনে নেওয়া যায়—সেই সবচেয়ে লম্বা আর সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী পুরুষই পুরুরাজ পুরুকুৎস। হাঁটুর নিচে অবধি অধোবস্ত্র। শরীরে চামড়ার দ্রাপি, ডানহাত বাইরে। অন্যান্য আর্যরা যদিও পশমী দ্রাপি পছন্দ করত, কিন্তু রাজার পছন্দ একটু বিশেষ ত হবেই। যদিও অন্যান্য রাজাদের চামড়ার পোষাক সোনার তার

দিয়ে সেলাই করা, কিন্তু পুরুকুৎস সাধারণভাবে থাকতে ভালবাসেন। তার সঙ্গে যে সব রাজকুমাররা ঘুরে বেড়ায় তাদের চেহারাও তাকিয়ে দেখবার মত। তাকে দেখে কেউ যদি ইন্দ্র বলে ভুল করে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

সত্যিই দেবতাদের ইন্দ্রের মত মনুষ্যকুলে ছিল পুরুকুৎস। বরং ইন্দ্রের চেয়েও পুরুকুৎস এর দেহ সুদৃঢ় সুন্দর ছিল। ইন্দ্রের চেহারার বর্ণনায় জানা যায় তার বপোদর ছিল। কিন্তু পুরুকুৎসের পেটে চর্বির নামমাত্র ছিল না। সমস্ত শরীরে যা কিছু চোখে পড়বার মত তা হ'ল সুন্দর পেশী। যেমন ক্ষীণ কোমর, তেমনি বিশাল বুকের ছাতি। যেন বিরাট ষাঁড়-এর দুটো কুঁজ ওর বুকের উপর স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করছে।

পুরুকুৎস এক আখড়া থেকে অন্য আখড়ায় ঘুরে ঘুরে তরুণদের শরীর চর্চা পরিদর্শন করছে। ওর গতির মধ্যে গম্ভীরতার সঙ্গে সৌন্দর্য ছিল কিন্তু যৌবনসুলভ চঞ্চলতা নেই।

ঘুরতে ঘুরতে একটা আখড়ায় এসে শরীর থেকে দ্রাপি খুলে কাপড় বেঁধে ব্যায়াম করতে আরম্ভ করে। তারপর উপস্থিত তরুণদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নেমে পড়ল। লড়াই করতে করতে সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যায় কিন্তু এতটুকু পরিশ্রান্ত মনে হয়না।

পুরুগণ তাদের নেতার পৌরুষ দেখে মনে মনে গর্ব অনুভব করে।

ব্যায়াম শেষ হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পুরুকুৎস অগ্নি-শালায় গিয়ে উপস্থিত হয়। এখানে সাদা দাড়ী-গোঁফওয়ালা কিছু লোক বিরাট অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে দীর্ঘস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে স্তুতি করছে।

পুরুকুৎস স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটি আসনে বসে পড়ে। চারিদিকে মাটি আর তামার কলসীতে সোম ভর্তি।

অগ্নিকে সোম অর্পণ করা হয়। দেবতাদের অর্পণ না করে কোনো কিছু খাওয়া বা গ্রহণ করাকে আর্যরা পাপ মনে করত। অগ্নির পর ইন্দ্রের আবাহন হয়। তারপর ইন্দ্রের পৌরুষ গাথা সুর করে গাওয়া হয়। তারপর ছাতুর সঙ্গে সোম পান করে উপস্থিত সকলে। যদিও এটা কোনো বিশেষ দিন নয়। তাই দিনের কাজে অসুবিধা না হবার মত মাত্রায় পান করে সকলে।

দিনের শেষে সন্ধ্যার শুরু থেকে আবার শুরু হয় সোমপান, নাচ আর গানের আসর। এই সময়ে সকল আর্যের চোখ রক্তবর্ণ। পানের মাত্রার কেনো সীমা নাই। যদিও পুরুরাজ্যে রাজাদেশ ছিল কেউ যেন অত্যাধিক পান করে কাজে অনুপযুক্ত না হয়।

অবশ্য রাজা স্বয়ং কারো কম যায়না। তবে তার স্বাভাবিক সংযম রক্ষা করবার ক্ষমতা ছিল। আজ পর্যন্ত কখনো কেউ তাকে সোমপানের মাত্রাধিক্যর জন্য বুদ্ধিভ্রংশ হতে দেখেনি।

রাত্রি অর্দ্ধেক বাকী আছে।

রাজা পুরুকুৎসকে কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে কোনো বিশেষ বিষয়ে মন্ত্রনা করতে দেখা যায়। একজন মন্ত্রী বলল,—

—কিলাত জাতি এখান থেকে এক যোজনের বেশি দূরে নেই। ওদের কাছে বহু পশু রয়েছে। নরম পশমওয়ালা ভেড়া আছে অসংখ্য।

—কিন্তু কিলাতদের পাহাড় থেকে নিচেয় নামবার সময় ত এটা নয়।

—যদিও ঠিক সময় আসেনি, তবে শরৎকাল শুরু হয়ে গেছে। সামনে শীত। অতএব শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে উঁচু পর্বত থেকে ওদের নিচেয় নামতেই হবে। অন্য আর একজন প্রৌঢ় বলল,—

—এবার বর্ষাকালে যেমন পুরো চারটিমাস ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েছে, তেমনি শীতও খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছে। আমাদের এখানে

যখন বর্ষা হয় পাহাড়ের উপরের দেশে তখন হিম পড়ে। হয়ত সেই জন্যে কিলাতরা নিচেয় আসবার জন্য তাড়াতাড়ি করছে। প্রথম পুরুষ তৃতীয় পুরুষের কথার উত্তরে বলল,—কিলাতরা এখনো তাদের ঘেরা মজবুত করে উঠতে পারেনি। এবার পুরুকুৎস বলে।

—কিন্তু ওদের লোকজন ত সব এসে গেছে। যাইহোক আমাদের প্রধান কাজ হল ঐ দেববিদ্বেষী কালোচামড়ার লোকগুলির গরু-বাছুর প্রভৃতি পশুগুলি অধিকার করা। ইন্দ্রের আজ্ঞা হ'ল দেব-দ্বেষীদের কাছে ধন থাকা উচিত নয়। কয়েক বছর যাবত সেই কথা চিন্তা করছি কিন্তু কিছু ব্যবস্থা করে উঠতে পারছি না।

—এখন পর্যন্ত আমরা পণি আর নিষাদ জাতিকেই আমাদের প্রধান শত্রু বলে ভাবতাম। কিন্তু কিলাতরা ক্রমে ক্রমে বেশ বেড়ে উঠেছে। বলল তৃতীয় মন্ত্রী। ওরা ভীষণ দুর্দান্ত এবং যুদ্ধপটু। দেহের গঠনে ওরা আমাদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা দু-একবার ওদের সঙ্গে চেষ্টা করে দেখেছেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ওরা পণি জাতির মত যুদ্ধোচিত [illegible]ভাব থেকে বঞ্চিত নয় অথবা নিষাদ জাতির মত একেবারে বোকা বুনো নয়। তাই আর্যরা এখনও কিলাতদের সঙ্গে তেমন লড়বার মত লড়াই করেনি।

অন্য একজন মন্ত্রী সায় দিয়ে বললেন,—পণি আর নিষাদ জাতিকে আমরা দাস বানিয়ে রাখতে সমর্থ হলেও কিলাতদের জয় করতে পারিনি। যেমন নীল গাইকে আমরা পোষ মানাতে পারিনি। তা যদি পারতাম তাহলে আমাদেব সবচেয়ে উপকার হত। কারণ মৃগ জাতির এই নীল গরুগুলিতে মৃগের চেয়ে অনেকগুণ বেশি মাংস হয়ে থাকে এবং দুধ ত বহুগুণে বেশি হবেই। অথচ আজ পর্যন্ত আমরা ওদের একটা বাছুরকে পর্যন্ত আটকে পোষ মানাতে পারিনি।

—বেশ, কিলাতদের দাস বানাতে না পারলেও ওদের পশুগুলিকে ত পেতে পারি? বলে রাজা পুরুকুৎস। প্রথম মন্ত্রী উত্তরে বলেন,

—ওদের গোচারণ ভূমিতে আমাদের প্রয়োজন আছে। আমাদের পরিবার যেমন ক্রমশঃ বাড়ছে, তেমনি পশুসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব গোচারণভূমি বেশী দরকার।

—বেশত, ইন্দ্রের উপর আমাদের বিশ্বাস রাখা কর্তব্য। তাঁর আজ্ঞা আমরা অবশ্যই পালন করব। বলল কুৎস।

দুধের মত সাদা দাড়ীতে হাত বোলাতে বোলাতে এতক্ষণ পর পুরোহিত বললেন,—কুৎস্ ঠিক বলেছে। মঘবা বহুবার আমাদের বলেছে—আমি এই বিস্তৃত ভূ-ভাগ আর্যদের দান করলাম। তাই আমাদের প্রত্যেক সংগ্রামে সে আমাদের সহায়ক হবে। তিনি বলেছেন,—"যদি পুরু জাতি ইন্দ্রের শত্রুদের হাত থেকে এই ভূমিকে উদ্ধার না করে তাহলে আমি ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ তুলে নেব।

আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ ইন্দ্র আগে থেকে কিলাতদের সাত-পুরী ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা করেছে। এখন শুধু আদেশ অথবা প্রতিজ্ঞা পালন করতে যা দেরি।

উষার আগমনের অনেক বাকী। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। সমস্ত প্রাণীজগত ঘুমে অচেতন। কখনো কখনো দূরের জঙ্গল থেকে ক্ষুধিত হিংস্র জন্তুর ডাক শোনা যায়। তাছাড়া শুধু হাওয়ার ঝির ঝির শব্দ।

এমনি সময়ে পুরু নগরীতে কাড়া-নাকাড়া ( গর্গরা ) বেজে ওঠে। মুহূর্তে সকলে জেগে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

সকল পুরু তরুণ আর প্রৌঢ়রা তাদের বিশালকায় লাল রঙের ঘোড়ার পিঠে এসে ওঠে। হাতে তাদের লম্বা লম্বা বর্শা। বাঁ

কাঁধে ধনুক। তূণ ভরা তীর। মাথায় তামার শিরস্ত্রাণ-আর শরীরে সোনার কাজ করা লাল চামড়ার দ্রাপি। ডান কোমরে তরবারী। বাঁহাতে ঘোড়ার রজ্জু আর মোটা চামড়ার ঢাল ধরা রয়েছে।

সকলের আগে রাজা পুরুকুৎস অরুণ রঙের বিশেষ পারদর্শী ঘোড়ার পিঠে বসে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে,—বীর ভাই সব, আজ কিলাতদের পুরীতে গিয়ে আমরা উষাবন্দনা করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকালের আগে আমাদের পৌঁছতেই হবে।

প্রধানের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল পুরু সেনা উত্তর দিকে রওয়ানা হয়। সংখ্যায় তারা পাঁচ শ-য়ের কিছু বেশি হবে। এরা সকলেই বাছাই করা সুপুষ্ট, দীর্ঘদেহী যোদ্ধা। এদের ঘোড়াগুলি অসাধারণ উঁচু, লম্বা এবং লালরঙের।

অন্ধকারের বুক চিরে বিরাট সোনাবাহিনী তীরের মত এগিয়ে চলেছে। শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। ওদের চেহারা অন্ধকারের মধ্যে মিশে এক হয়ে গেছে।

চলতে চলতে ওরা ঘগ্‌ঘরা নদীর তটে এসে পৌঁছয়। নদীর ধারে রাস্তা শুকনো হলেও সেখান দিয়ে গেলে পাথরের শব্দ হবে; তাই ওরা আরও খানিক ধার ঘেঁষে চলতে থাকে। কিলাত নগরীর কাছাকাছি এসে ওরা আরো সন্তর্পণে চলতে থাকে।

ইন্দ্র এবং নিজেদের শক্তির উপর এই পুরুজাতির খুব আস্থা ছিল। কিলাত অসাধারণ শত্রু। ওদের দমন করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে কিলাত গ্রাম। একদিকে পাহাড়ের প্রাচীর আর তিনদিকে মজবুত কাঠের প্রাচীর. এক দিকে পশুদের থাকবার বেড়া বা খোঁয়াড়। পুরো গ্রামটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত।

পুরু সেনা অতর্কিতে শত্রুর উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কিলাতদের পাহারাওয়ালা কুকুরগুলি সজাগ রয়েছে।

শত্রুর আগমন জানতে পেরে কুকুরগুলি একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠে। এক মুহূর্তে সমস্ত কিলাতপুরী সজাগ হয়ে যায়।

কাড়া-নাকাড়া আর জয়ঢাকের শব্দে কানে তালা লাগবার উপক্রম। পলক পড়তে পড়তে কিলাত যোদ্ধারা যেখানে প্রথম কুকুরের ডাক শুনেছিল সেখানে এসে হাজির।

ঊষার হাল্কা কিরণ পূব আকাশে জেগে উঠতে থাকে। আর্যসেনা কিলাত প্রাকারের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সামনেই কিলাত যোদ্ধারা এসে পৌঁছে গেছে।

দুই দল একে অপরের এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে তীর চালাবার অবসর পাওয়া যায়না। অগত্যা তরবারী আর বর্শা দিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে কিলাত-স্ত্রী'রা কিলকারীর সাহায্যে পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। চারিদিকে যেন পাথরের বৃষ্টি হতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পূবগগনে সূর্যদেবের লাল গোলা দেখা দেয়। এখন আর অন্ধকারের চিহ্নমাত্র নেই।

কিলাতদের প্রচণ্ড প্রহারে পুরু সেনা দুই তিনবার নিরাশ হয়ে ঘুরে আসে। আবার নতুন উদ্যমে আক্রমণ করে। পুরু সেনার লম্বা লম্বা বর্শা এবার খুব কাজ দেয়। কিলাত সেনা ঘাঁটি ছেড়ে পিছনে সরে যেতে বাধ্য হয়।

এমনি সময়ে সুযোগ বুঝে কয়েকজন পুরু সেনা ঘোড়াথেকে নেমে কাঠের প্রাচীরের খিল খুলে দেয়, এবং পুরু সেনাদল হুড় হুড় করে ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ে।

কিলাতরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিজেদের অজেয়তার উপর ওদের খুব গর্ব ছিল। অনন্তকাল

ধরে ওরা শীত কাটাবার জন্য ওদের পশু নিয়ে পাহাড়ের নিচেয় এই জঙ্গলে আসছে। পাহাড়ের কাছ থেকে দূরে যাওয়া ওরা পাপ মনে করে। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে পর্বতের উপর যখন চার-পাঁচ হাত মোটা বরফ পড়তে থাকে, তখন পশুদের ভীষণ কষ্ট হয়। তাই বাধ্য হয়ে কিছু কালের জন্যে ওরা নিচেয় নেমে আসে। সেই কয়েক মাস হিমালয়ের পাদদেশে বিশাল এই অরণ্যের মধ্যে ওরা গ্রাম বসায়।

এর আগে এক-আধবার আর্যদের সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ হয়েছে। তার কোনোবারেই ফলাফল নির্দ্ধারিত হয়নি। তাই বংশ পরম্পরায় ওদের জাতির মধ্যে প্রচার হয়ে আসছে,—পুরু জাতি আমাদের কাছে ভীষণ ভাবে হেরে গিয়ে আমাদের নাম মুখে আনতেও ভয় পায়।

তাই আজও যখন পুরু সেনা ঘেরার ভিতর ঢুকে পড়েছে, তখনও কিলাত যোদ্ধাদের মনোবল এতটুকু কমেনি।

সামনে বিরাট চওড়া প্রাঙ্গন। দুই দলের যোদ্ধা সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে আর্যদের অনেক যোদ্ধা আহত হয়েছে, অনেক যোদ্ধা নিহত হয়েছে। কিলাতদেরও ক্ষতি কম হয়নি। দুই দলেরই ক্রোধের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়, এতক্ষণে ভীষণ হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কোথাও তরবারীর লড়াই চলছে ত কোথাও গদার লড়াই। কিলাত নারীরা খুব তৎপরতার সঙ্গে পাথর ছুঁড়ছে। কিন্তু আর্য যোদ্ধাদের প্রত্যেকের মাথায় রয়েছে শিরস্ত্রাণ। শুধু দেহের কোথাও যদি পাথর লাগে ত আঘাত লাগতে পারে।

পুরুকুৎস-এর রণকৌশল দেখবার মত।

হয়ত এমনি আর্য বীরকে দেখে ইন্দ্রের কল্পনা করা হয়েছিল কোন এক কালে।

নিজের লাল ঘোড়ার পিঠে বসে পুরুকুৎস এখান থেকে সেখানে

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেড়ায়। যেখানেই নিজের সেনাকে দুর্বল দেখতে পায় সেখানে তার হাতের খড়্গ চমকে ওঠে। একটি মাত্র আঘাতই একজন কিলাতের মাথার পক্ষে যথেষ্ট।

কিলাত সেনা সংখ্যায় ছিল পুরু সেনার চেয়ে অনেক বেশি। তাই তাদের ক্ষতির পরিমাণ অধিক হলেও তাদের আঘাতের বেগ কমেনি।

পুরুসেনার পক্ষেও এই প্রথম এতবড় দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে পালা পড়েছে। যারা আহত অবস্থায় পড়ে আছে তাদের মন দারুণ নিরাশায় ভরে ওঠে। হয়ত ইন্দ্র এ সময়ে কোনো কাজে আটকা পড়ে তাদের কথা ভুলে গেছে।

কিলাত পুরীর প্রাঙ্গন রক্তে লাল হয়ে গেছে।

একদিকে দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণের আর্যযোদ্ধা আর অন্যদিকে খর্ব, পীতাঙ্গ কিলাত, একে অন্যের দলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তরবারী আর পাথরের গদার ( বজ্র ) আঘাত করছে। আর অন্যদিকে জমির উপর সাদা-কালো উভয় দলের আহত সৈনিক নিঃসহায় অবস্থায় পড়ে একে অন্যের রক্তের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত করছে।

পুরুসেনাকে একের পর এক আহত হয়ে পড়তে দেখে কুৎস ঘোড়া থেকে নেমে ভয়ানক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অস্ত্রচালনা করতে থাকে। কিন্তু কিলাত সর্দারও কম যায় না। আকৃতিতে কিলাত সরদার পুরুকুৎস-এর কাঁধ পর্যন্ত হলেও তার শরীর লোহার মত শক্ত আর পেশীবহুল। অসাধারণ চওড়া তার বুকের ছাতি আর তেমনি দৃঢ় বাহু। কিলাত সর্দার কয়েকজন বাছাই পুরু যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করতে পুরুকুৎস ভাবল ওকে ধরাশায়ী না করতে পারলে কিলাতদের সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব।

কিন্তু মনে ভাবা আর কাজে পরিণত করা এক কথা নয়।

কয়েকবার তাক করে আঘাত করা সত্ত্বেও কিলাত সরদার

তেমনি অবলীলাক্রমে সে আঘাত প্রতিহত করে পুরুরাজের উপর প্রত্যাঘাত করতে থাকে,

হঠাৎ কিলাত সরদারের তরবারীর প্রচণ্ড এক আঘাত এসে পুরুরাজের জানুতে লাগে। সে আঘাত সহ্য করা পুরুরাজের কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পুরুরাজ পড়ে যেতে যেতে তার তরবারীর শেষ ও প্রচণ্ড আঘাত করে কিলাত সরদারের কাঁধে।

সেই মুহূর্তে কিলাত সরদার একটু অসতর্ক হয়ে পড়ায় পুরু-রাজের আঘাত ঠিক সময়োচিত হয়েছিল।

পড়ে গিয়েও পুরুরাজ আনন্দিত হল তার আঘাত ব্যর্থ হয়নি বলে। কিলাত সরদারের দেহ থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে।

কিলাত সরদারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাকী কিলাতরা পর্বতের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। পুরুসেনাও কিছুদূর তাদের পিছনে তাড়া করে। কিন্তু কিলাতের সঙ্গে পাহাড়ে ওঠা পুরুদের পক্ষে অসম্ভব, তাই ওখান থেকেই ওরা ফিরে আসে।

সূর্য তখন অস্তাচলে।

পুরুকুৎস সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। জানুতে পট্টি বাঁধা সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ হয়নি।

কিলাতপুরী পুরুসেনার দখলে এসেছে, কিন্তু এর জন্য ওদের খুব বড় রকমের মূল্য দিতে হয়েছে।

সকল পুরু যোদ্ধারা পুরুকুৎসের পাশে বসে ভাবছিল এবার বোধ হয় কুৎসের প্রাণরক্ষা হবে না। কিছুক্ষণ পরে কুৎস ধীরে ধীরে চোখ খোলে। ইশারা করে জল চায়। জল খেয়ে পুরুকুৎসের জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে আসে।

উপস্থিত সকলে ইন্দ্রের জয় ঘোষণা করে।

পুরুকুৎসকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলে বলেন,—কিলাতদের আমরা জয় করেছি। আঘাতপ্রাপ্ত কিলাত একজনও বেঁচে নেই।

বাকী স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধা সহ কিছু কিলাত পাহাড়ের উপরে পালিয়ে গেছে। এখন কিলাতদের এই গ্রাম আর ঐ অসংখ্য গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির মালিক আমরা।

এই সকলই ইন্দ্রের মহিমা।

কিলাতদের পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরু নগরীতে সংবাদ নিয়ে দূত চলে যায়। সন্ধ্যার আগেই শত শত পুরু স্ত্রী পুরুষ ঘোড়ায় চেপে কিলাত নগরীতে এসে পৌঁছায়।

পুরুকুৎসের একবার জ্ঞান হবার পর আবার জ্ঞান লোপ পায়, পুরুকুৎসের স্ত্রী স্বামীর অবস্থা দেখে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বামীর মাথা কোলের উপর রেখে বসে। ওর চোখের জলের ধারায় স্বামীর মুখ ধুয়ে যায়। বৃদ্ধ পুরোহিত সান্তনা দিয়ে বলেন,—বীর পত্নী, চিন্তা করো না। ইন্দ্র স্বয়ং তার যজমানকে রক্ষা করেন। তাঁরই কৃপায় আমরা জয়লাভ করেছি। তিনি বলেছেন, আমার ভক্ত দাসজাতির সাতটা পুরী ধ্বংস করবে। এ তো সবে একটা হল।

তুর্বশ কন্যা পুরুকুৎসানী খুব গম্ভীর প্রকৃতির মহিলা। বীর পতির মতই কর্তব্যে অচল অটল।

তুর্বশ জাতির সঙ্গে পুরুজাতীর তেমন বনি-বনাও ছিল না। কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় পুরুকুৎসানী পুরুকুৎসের গলায় মালা দিয়ে বীরধর্ম রক্ষা করেছিল।

গোলাপী রঙ, সোনালী চোখ, হলুদ লম্বা কেশদাম, নিটোল সুডোল দেহলতা। সমগ্র আর্যজাতীর মধ্যে তুর্বশ কুমারী সেরা সুন্দরী।

তুর্বশ কুমারী জানত আর্যবীরের ধর্মই যুদ্ধ করা। শত্রুকে নিপাত করা আর প্রয়োজনে নিজের প্রাণদান করা। আর্যপত্নীর কাজ পতীকে প্রোৎসাহিত করা এবং তার কাজে সহায়তা করা। সে জানে তাদের পিতৃপুরুষেরা আকাশে থেকে তাদের সন্তানদের পরাক্রম দেখছেন। কাপুরুষকে তারা কখনোই ক্ষমা করেন না।

বীরের জীবনে তুটি মাত্র লক্ষ্য। বিজয়লাভ করে শত্রুর পশু, ধন, সম্পত্তির উপর নিজের অধিকার স্থাপন করা, অথবা মরে পিতৃপুরুষের কাছে পৌঁছানো।

এতখানি জেনে শুনেও পুরুকুৎসানীর মন ভিতরে ভিতরে যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। ওদের তুইজনের মধ্যে অসাধারণ প্রেম ছিল। কর্তব্যের খাতিরে যদিও মাঝে মধ্যে আলাদা হয়ে থাকতে বাধ্য হত। নইলে ওদের তুজনের শরীরে একটি প্রাণ।

অর্ধরাত্রির পর খুব শীত পড়ল। সকলে যার যার দ্রাপি টেনে গায়ে দিল। কিন্তু পুরুকুৎসানীর যেন সে সব দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন স্বামীর দিকে সজাগ হয়ে রয়েছে। চর্বীর দীপের আলোতে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। নিয়ম মত শ্বাস বইছে, বিশাল বুক ওঠা নামা করছে। কিছুক্ষণ আগে রক্ত বন্ধ হয়েছে।

পুরুকুৎস চোখ খোলে। তার মুখের উপর ঝুঁকে থাকা আর একটি মুখের দিকে তাকায়। টপ টপ করে তুফোটা অশ্রু ওর কপালের উপর এসে পড়ে। চোখ না খুলে কুৎস অনুভব করতে পারে পুরুকুৎসানীর মনের অবস্থা। ধীরে ধীরে হাত তুলে কুৎস স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। পৃথিবী তখনো অন্ধকারে আবৃত। নইলে পুরুকুৎসানীর তখনকার মুখের চেহারা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

পুরুকুৎসানী 'প্রিয়তম' বলে স্বামীর বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরে ছিল। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের এই অনুপম স্পর্শ অনুভব করে। এমন সময় বাঁ পাখানা টানতে গিয়ে কুৎস চীৎকার করে ওঠে। এখনো ও জানতো না ওর পায়ের আঘাতের ভয়ঙ্করতা। কিন্তু আঘাতের জন্য কাতরানো আর্যবীরের পক্ষে লজ্জার কথা।

—আমার পায়ের আঘাতটা কি খুব বেশী? ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, খুব বেশী। বলল কুৎসানী।

—বীরত্বে কিলাত আমাদের চেয়ে কম যায় না। তাদের সর্দার পরাক্রমে অদ্বিতীয়। ওর শবটা কি হয়েছে?

—আমাদের লোক এখনো শবদাহ করতে ব্যস্ত রয়েছে। আর্যশব জ্বালানো শেষ হয়ে গেছে। এখন কিলাত-শব জ্বলছে।

কিলাতপুরীর সব কিছু এখন আর্যদের দখলে। ওরা ইচ্ছে করে শবদাহের ব্যবস্থা করেছে। যদিও বুনো জন্তুরা দু-চার দিনে এ কাজ শেষ করতে পারত কিন্তু ততদিনে হয়ত পচা গন্ধে এখানকার বাতাস বিষাক্ত হয়ে যেত।

পুরুকুৎসের খুব ইচ্ছা ছিল ওর প্রতিদ্বন্দী কিলাত সর্দারের শবদেহ নিজে থেকে খুব সম্মানের সঙ্গে দাহ করবে। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেছে।

এই মহান বিজয় উপলক্ষে বিরাট হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বৃদ্ধ ঋষি অগ্নিদেবের মুখে ঘৃতাহুতি দিলেন। ইন্দ্রের জন্য কিলাতদের দখলকরা পশুর ৩৫টা বৃষ মেরে রান্না করে এবং কলসী কলসী সোমরস দান করা হয় খুব ঘটা করে।

পুরু হোতা ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিয়মমত যজ্ঞশেষ গ্রহণ করে, কিন্তু কারো মনে শান্তি ছিল না সেই রাত্রে। এই বিজয়ের চেয়েও তাদের কাছে মূল্যবান ছিল তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সেনানী পুরুকুৎস। সকলে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে,—হে ইন্দ্র! তোমার ইচ্ছায় আমরা বিজয়লাভ করেছি, কিন্তু এসব ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমরা পুরুকুৎসকে হারাই। ইন্দ্র ঋষির মুখ দিয়ে দৈববাণী করে,—ইন্দ্রের উপর বিশ্বাস রাখো। পুরুকুৎস আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

রাত্রের শেষদিকে পুরুকুৎস বেশ প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। লোক বার বার ওর সংবাদ নিয়ে খুশী হয়।

সকালে পুরুকুৎস উষা বন্দনা ও প্রার্থনা করে। কুৎসানীও স্বামীর মঙ্গল কামনায় বিশেষ যজ্ঞ ও প্রার্থনা করে।

ইন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হ'ল। পুরুকুৎস কিলাতদের

সাতটা নগরী ধ্বংস করতে সফল হয়। অপার পশু ও ধন দখল করে পুরু সম্প্রদায়।

কিলাতদের সবচেয়ে মূল্যবান ধন ছিল পশু। পশুপালনই তাদের জীবিকার একমাত্র উপায় ছিল। চাষের প্রচলন এখনও ওদের মধ্যে হয়নি। জঙ্গলের ফল সংগ্রহ করে কিছু কিছু শুকিয়ে জমা করে রাখত বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি নগণ্য।

অন্যের দেখাদেখি পার্বত্য ভূমিতে কোথাও কোথাও সামান্য কিছু চাষের চেষ্টা করতে দেখা যেত কিন্তু তা মানুষের কোনো প্রয়োজনে আসত না। পশুদের খাবার উপযোগী ঘাস প্রভৃতি ছিল মূখ্য ফসল।

কিলাতদের বাকী ছয়টি নগরী তারা খুব সহজে আর্যজাতিকে দখল করতে দেয়নি। তবে প্রথম জনপদ ধ্বংস হবার পর থেকে ওদের মনোবল ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে।

পুরুকুৎসকে সুস্থ হয়ে উঠতে মাসাধিক সময় লাগল। পুরু জনপদের কারোরই ইচ্ছা নয় যে এই শরৎকালে কুৎস আবার কোথাও যুদ্ধে যাক। কিন্তু কুৎস কারো কথা শোনবার পাত্র নয়।

কিলাত জাতিকে সম্পূর্ণ দমন না করা পর্যন্ত তার মনে শান্তি নেই।

ঘগঘরা-র পূর্বদিকে মাকণ্ডা, স্বরস্বতী এবং যমুনার আশপাশে কিলাতদের তিনটি শারদ-নগরী ছিল। ঘগঘরার পশ্চিমে শতলজ পর্যন্ত ছিল আরো তিনটি নগরী।

প্রথমবারের মত অতখানি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি পুরুকুৎসকে। বাকী ছ-টি কিলাতপুরী তেমন সুদৃঢ় ছিল না। এসব দিকে যোদ্ধাও প্রথমবারের মত অসংখ্য ছিল না মোট কথা কিলাতরা এই সকল জনপদগুলির প্রতিরক্ষার দিকে তেমন নজর দেয়নি।

ধনের মধ্যে একমাত্র পশুধন ছাড়া এ সব কিলাতপুরীতে আর কিছু লাভ হয়নি। ভেড়া পুরুদেরও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কিলাতদের ভেড়ার পশম যেমন মোলায়েম বা দামী ছিল তা আর কারো ছিল না।

সতলজ থেকে যমুনা পর্যন্ত সকল তরাই ভূমি পুরুদের চেষ্টায় কিলাতশূন্য হ'ল। এখন পুরুজাতির গোচারণ ভূমি সম্পূর্ণ তরাই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করল।

প্রচণ্ড বরফের তাড়নায় কিলাতরা শুধু শরতকালটা কাটাবার জন্য উঁচু পর্বত থেকে নিচেয় নেমে আসত। বহুদিন যাবৎ কোনো শত্রুর কাছে বাধা না পেয়ে তারা নিশ্চিন্তে শারদ-পুরীতে এসে বাস করত।

কিন্তু এবার পুরুজাতির কাছে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে অসংখ্য পশু আর মানুষ হারিয়ে ওরা ভীষণ দমে গেল। ওদের সকল শারদ-পুরী হাতছাড়া হয়ে যেতে শরৎকালে ওদের কষ্টের আর সীমা রইল না।

কখনো কখনো ওরা লুকিয়ে দূরের উঁচু পর্বতের উপর দিয়ে ওদের ছেড়ে আসা গ্রামের দিকে, ওদের পশুচারণ ভূমির দিকে তাকিয়ে দেখত। বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে আর্যদের অসংখ্য ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতিকে আনন্দে চরতে দেখে কিলাতদের মনের অবস্থা যা হত তা বর্ণনা করা যায় না।

দু-একবার কিলাতরা চোরা আক্রমণ করেছে, কিন্তু আর্যরা এখন আগের চেয়ে বহুগুণে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী হয়েছে।

পুরুরাজ পুরুকুৎস এখন সপ্তসিন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। এ যাবত আর্যজাতির কোনো শাখা কোথাও কিলাতদের উপর এমন বিজয়-লাভ করতে পারেনি অথবা তাদের শরৎকালীন চলায়মান পুরীগুলির উপর এমনি একের পর এক আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি।
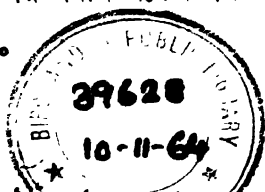
কোথাও হয়ত জঙ্গলে পশুদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে কিছু পশু লুঠ করে নিয়ে গেছে, কিন্তু তাকে শুধু দস্যুবৃত্তি বলা যায়। দস্যুবৃত্তি অবশ্য আর্যদের কাছে খুবই লজ্জার কথা।

একাদিক্রমে তিন বৎসর যাবত প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পার্বত্য কিলাত জাতির সাতটা জনপদ পুরুজাতির দখলে আসে।

দ্বিতীয় বৎসরে পুরুকুৎসানী এক পুত্র-সন্তানের জন্ম দেয়। পিতা পুরুকুৎস দস্যুদের ত্রস্ত করতে ব্যস্ত ছিল বলে পুত্রের নাম রাখা হল ত্রসদস্যু।

সকল আর্য জনের মধ্যে পুরু ছিল শ্রেষ্ঠ জন। আর পুরুকুৎস ছিল পুরুজাতির জ্যেষ্ঠ। তার জ্যেষ্ঠ সন্তান ত্রসদস্যু যে পিতার সকল গুণের উত্তরাধিকারী হবে একথা বলাই বাহুল্য।

তবে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে উপযুক্ত সময়ে।

ত্রসদস্যুর জন্মোৎসবে সমগ্র পুরু জনপদে এমন উৎসব পালন করা হয়েছিল যা দেখলে স্বভাবতই মনে হত বোধ হয় কুরু জনপদের প্রত্যেক পরিবারে প্রথম সন্তান জন্ম নিয়েছে।

প্রথম সন্তান প্রাপ্ত হতে পুরুকুৎসানীর অবশ্যই যথেষ্ট দেরী হয়েছে। তাই ইন্দ্রের উপর তার কৃতজ্ঞতার তুলনা হয় না। পুত্রের দিকে তাকালেই স্বামীর তেজপূর্ণ শরীরের প্রতিচ্ছবি মনে হত।

পুরুকুৎসানী সর্বদা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করত, তার সন্তান যেন তার স্বামীর মত বীর হয় এবং নামের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করে দস্যুদের মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে।

দিন আসে, দিন যায়।

ত্রসদস্যু কলায় কলায় বাড়তে থাকে।

পুরুকুৎস আর পুরুকুৎসানী দুই প্রেমিক যুগল, দুই সার্থক মাতা পিতা তাদের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীর বাড়ন্ত দেহের দিকে চেয়ে দেখে আর ভবিষ্যতের জাল বোনে।

## ॥ দুই ॥

"সময় খৃঃ পূঃ ১২১৭"

"ইযমদাদ দিবোদাসং বধ্রযশ্বায় স্বরস্বতী"

সপ্তসিন্ধুর সবচেয়ে পূর্বদিকের প্রসিদ্ধ নদী স্বরস্বতী তার অন্যান্য ছয় বোন যথা সতলজ, বিপাশা, রাবী, বিতস্তা ও সিন্ধু-এর মত হিমগলিত স্রোতস্বিনী বা সদানীরা ছিল না। শীত ও গ্রীষ্মকালে স্বরস্বতীর ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যায়।

কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী তারই তীরে আর্যজনকে স্থায়ীভাবে বাস করবার অধিকার দিয়েছে স্বরস্বতী। তাই আর্যরা স্বরস্বতীর আর ছয় বোনের চেয়ে তার কাছে অধিক কৃতজ্ঞ।

রাবী অথবা পরুবত্তী নদী ছিল সপ্তসিন্ধুর ঠিক মাঝামাঝি। আর্যজন জানত রাবীর উপর ইন্দ্রের অসীম কৃপা। তবুও তারা স্বরস্বতীকে ভালবাসত অন্যের চেয়ে অধিক।

স্বরস্বতীর কয়েক যোজন দূরে গেলে যমুনা বিশাল রূপে প্রকাশিত। তবুও আর্যরা তাকে নিজের বলে ভাবত না। যমুনার তটবর্তী এলাকায় দুর্দান্ত দস্যুর আধিপত্য ছিল। যদি স্বরস্বতী ওদের শরণ না দিত বা সহায়তা না করত, তাহলে ঐ দুর্দান্ত দস্যুর কাছে আর্যদের অনেক দিন আগেই পরাস্ত হয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হত।

এই রাবীর তট থেকেই পুরুজন-এর এলাকা শুরু হয়েছে।

পুরু জন এখন আর একটা অখণ্ড জন নেই। তারা কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

মধ্য স্বারস্বত দেশ ছিল পুরু শাখা "কুশিক"দের। তার উত্তরে

রাবী নদীর পূব ও পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল ভরত। আর অন্যদিকে ছিল "তৃৎসু"।

নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ হলে এক জন—অন্য জনকে তাদের এলাকায় গোচারণ বা জীবিকা অর্জনের অনুমতি দিত না। শান্তির সময়ে অবশ্য কারো কোনো বাধা নিষেধ থাকে না। কলহের সময় অন্যান্য জনেরা যার যার খুশীমত দলে যোগ দিত।

কিন্তু বাইরের শত্রুর সঙ্গে কখনো ঝগড়া বিবাদ হলে সকল আর্য নিজেদের আভ্যন্তরীন বিবাদ ভুলে গিয়ে এক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

স্বরস্বতীর তীরবর্তী এলাকাকে স্বারস্বত দেশ বলা হয়। এই স্বারস্বত দেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। সমস্ত দেশের মধ্যে স্বারস্বত দেশের গাভী সবচেয়ে বেশি দূধ দিত এবং তাদের বৃষ ( ষাঁড় ) সবচেয়ে সুন্দর ও বলিষ্ঠ হত।

ঘোড়ার বেলায় যদিও স্বারস্বত কারো পিছনে ছিলনা, তবে অন্য-দেশেও এদের প্রতিদ্বন্দী ছিল।

ভেড়ার চাষে গান্ধারী আর্যজন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এরা সিন্ধুর পশ্চিম দিকে বাস করত।

স্বারস্বত ভূমির অরণ্য নানাপ্রকার দামী দামী গাছে সমৃদ্ধ ছিল। অশ্বত্থ, খদির, বিভীদক, হরিদ্রু, কিংশুক প্রভৃতি গাছ আর মুঞ্জ, কাষ্ঠ, কুশ, দুর্বা প্রভৃতি তৃণ দিয়ে ঢাকা বিশাল স্বারস্বত অরণ্য। গ্রীষ্মকালে সেখানকার ডোবাতে, পুকুরে যখন শ্বেতকমল ফুটে উঠত, তখন চারিদিকের আকাশ-বাতাশ সুগন্ধে ভরে যেত। তখনকার সেই আরণ্য-সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।

স্বারস্বত নিবাসী ভরত অথবা কুশিক সকল আর্যরা ইন্দ্র এবং অগ্নির সেবা করত। প্রতি ঘরে ঘরে অখণ্ড অগ্নি জ্বলত। প্রতিদিন সকালে এই কুণ্ডকে প্রদক্ষিণ না করে কেউ কোনো কাজে হাত দিত

না, এবং সন্ধ্যায় প্রদক্ষিণ না করলে দিনের কর্তব্য শেষ হত না। সকালে সন্ধ্যায় আর্যগ্রামের প্রতি ঘর থেকে হোমের ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। সুগন্ধিতে মন ভরে যায়। আর গায়ত্রী ও সাম গীতের মধুর সুরে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

দস্যুদের দেশের কাছাকাছি বাস করতে হয় বলে ভরত ও কুশিক জাতিকে সদা সর্বদা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকতে হয়। সেজন্যে অবশ্য তারা নিজেদের সৌভাগ্যশালী বলে ভাবত। ওরা মনে করত দেব ইন্দ্র তাঁর বিজয়ের ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। যমুনার পারের কালো মানুষগুলির পক্ষে নিজেদের যথেষ্ট বলে ভাবত তারা। তাছাড়া প্রয়োজন হলে শুধু পুরু কেন সমগ্র আর্যজাতি তাদের পিছনে এসে দাঁড়াবে।

যমুনাপারের দস্যুরা যেমন সংখ্যায় বহু ছিল তেমনি তারা কোনো দিকেই দুর্বল ছিল না।

আর এদিকে পণি জাতির কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের উপর আর্যদের জয় পরাজয় নির্ভর করত।

শুধু অস্ত্র কেন, সোনা, তামা, মণি-মুক্তা প্রভৃতির স্বামী ছিল এই পণি জাতি। এসব ধন থেকে এত বেশি লাভ করত তারা যে নাগরিক জীবনে তাদের কোনো মূল্য ছিল না। সে দিক থেকে তারা খুব নির্বল ছিল। তাই বলে তারা একেবারে পৌরুষহীন ছিল না।

যমুনার পূবদিকের পাহাড়ী অঞ্চলে চেপ্টা নাক ওয়ালা অনাসশ্রেণীর কিলাত বাস করত। এরা খুব শক্তিশালী ছিল। এদের সঙ্গে পণি-জাতির প্রায়ই কলহ বিবাদ লেগে থাকত। নইলে এই দুই দাসজাতি যদি একসঙ্গে আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত তাহলে আর্যজাতি বহুদিন আগেই স্বরস্বতীর তট ছেড়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদ লেগে থাকবার জন্য ওরা চিরকাল আলাদা হয়ে রয়েছে।

পুরু জাতির প্রত্যেক জন বহু অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সন্তান জন্মদিয়ে তাদের জাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। পুরু সন্তান বশিষ্ঠ, কুশিক সন্তান গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র, ভরত সন্তান দেবশ্রবা, দেববাত প্রভৃতির গুণে স্বারস্বত ভূমি দস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

মিত্র-বন্ধুর সমাগম কে না চায়? কিন্তু আর্যজাতি মিত্র-বন্ধুর আবাগমনের জন্য বিশেষ ভাবে লালায়িত থাকত। নিজের জিবিকার জন্য গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুধন তাদের পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ওরা "কেবলাধি ভবতি কেবলাদী" অর্থাৎ "যে সবকিছু নিজে খাব মনে করে সে সব কিছু পাপ খায়" নীতিকে খুব মান্য করত।

একজন পিতার পাঁচ পুরুষ পর বিরাট পরিবারের সৃষ্টি হয়। আর সমগ্র পুরুজন-এর পনের-বিশ বংশ পর বিরাট পরিবারের সৃষ্টি হয়ে বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে বিভক্ত হয়ে গেলেও নিজ রক্তের মর্যাদা ছিল তাদের কাছে খুব মূল্যবান।

যে কোন পৌরব তাদের নিজের ঘরের সন্তান বলে আদর পেত। তেমনি যে কোনো আর্য সন্তানের জন্য সকলের ঘরের দরজা সর্বদা খোলা থাকত। অতিথিকে তারা দেবতুল্য ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। ঠিক যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে তারা অগ্নি সেবা করত, তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা পেত একজন সাধারণ অতিথি। এমনি করে এমন বহু আর্য পরিবার ছিল যাদের ক্ষমতার চেয়ে অধিক দুধ, দই, ছাতু, মাংসের ব্যয় হত। ফলে তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে অন্য জাতির কাছ থেকে ঐ সমস্ত সামগ্রী ছিনিয়ে আনা ধর্ম বলে মনে করত। এমন কি একই আর্য জন-এর মধ্যেও লুঠ-পাঠ হয়ে যেত। তবে ডাক পড়লে সব ভুলে তারা একআত্মা একপ্রাণ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সীমান্তে গিয়ে দাঁড়াত।

পুরুকুৎসানী আর তার ননদের মধ্যে সহোদরা বোনের চেয়েও স্নেহ ভালবাসা ছিল। পৌরবী অর্থাৎ কুৎসের ভগ্নীর সঙ্গে তৃৎসু জন-এর রাজা বধ্রযশ্ব-এর সঙ্গে বিবাহ হবার পর দুই ননদ বৌদীর ছাড়াছাড়ি হল। বিবাহের পর কিছুদিন দুইজনে ভীষণ মনমরা হয়ে থাকত। কিন্তু বেশীদিন গেলনা আবার দুজনের মিলন হতে। একসঙ্গে তিন বৎসর আবার ওরা ভরত ভূমিতে থাকবার অবসর পেল।

যমুনা পারের পণি জাতির শাখা পণি, অজ, শিগ্রু, যক্ষ প্রভৃতি এখনো আর্যদের কাছে মাথা নত করেনি। ওরা আর্যদের পরাক্রম জানত বলেই হয়ত যুদ্ধ এড়িয়ে চলত। কিন্তু আর্যরা ওদের শান্ত দেখতে পারে না। যতদিন ওদের জয় করা না যায় ততদিন আর্যদের মনে যেন শান্তি নেই।

এমনি এক সময়ে আর্য সেনা প্রস্তুত হ'ল। একসঙ্গে তিন পণি জাতির সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে একলা ভরত জাতির পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তাই পুরুদের সকল জন মিলিত হ'ল ভরত জাতির সঙ্গে।

স্বরস্বতীর উভয় তীর এবং যমুনার তটবর্তী বিশাল অরণ্যে এখন পুরু এবং তৃৎসু জাতীর পশুচারণ ভূমি। পণি জাতি আর্যদের কাছে হার মেনে যমুনার অন্যপারে পালিয়ে গেছে। গঙ্গানদীর তটবর্তী সমস্ত পণি-গ্রাম আর্যরা লুঠপাঠ করে নিয়ে গেছে। তবে নদীর সীমানা ছেড়ে আর্যরা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। কারণ নদীর ওপারের ভূমি সম্বন্ধে ওদের ধারণা খুব কম ছিল। শুধু ভূমি নয় ওদিকে পণিদের সংখ্যা সম্বন্ধেও কোনো জ্ঞান ছিল না। তাই বেশিদূর ওরা আর এগোয়নি তার প্রধান কারণ আর্যরা জানত তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পণি-জাতি সাধ্যমত পশ্চাদপদ হবে না।

আর্যরা কাজের উদ্দেশ্যে বা যুদ্ধের সহায়তা করতে নিজের জনপদ ছেড়ে ছ'মাস-একবৎসর বাইরে থাকতে অভ্যস্ত। ওদের সবচেয়ে বেশি দরকার হল অরণ্য। বর্তমান এই ভূমিতে পুরুজাতি একসঙ্গে এতদিন বাস করছে তার প্রধান কারণ ওদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই এখানে পাওয়া যায়।

কাছাকাছি জঙ্গলের অভাব নেই। গোচারণভূমিতে পশুর প্রয়োজনীয় ঘাস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে একটু আধটু চাষ করে ছাতু আর রুটির অভাব পূরণ করে নিতেও অসুবিধা হয় না।

তাই ভিন্ন ভিন্ন জননায়ক তাদের জন ও হাজার হাজার পশু নিয়ে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে এখানে বাস করছে।

এদের থাকবার জায়গা দূরে হলেও ঘোড়ার মত দ্রুতগামী বাহন সে অসুবিধা দূর করে।

পুরুষের মত আর্যনারীও সমান দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে পারে বা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করতে পারে।

তাই এবার যুদ্ধের সময় পুরুকুৎসানী তার ছয় বৎসরের শিশু 'কশোজু'কে সঙ্গে নিয়ে ননদ পৌরবীর স্বামী বভ্রযশ্বর এলাকায় বাস করতে গেল।

দীর্ঘদিন পর আবার পুরুকুৎসানী আর পৌরবী একজায়গায় হয়।

পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুর বর্তমান নাম হয়েছে 'কশোজু' অর্থাৎ ছড়ি নিয়ে পিছু তাড়া করে যে।

এর এক ইতিহাস আছে।

এক বৎসর হল সে ঘটনা ঘটেছিল। ত্রসদস্যু ছোটবেলা থেকে একটা ছড়ি নিয়ে ভেড়ার পালের পিছনে পিছনে তাড়া করতে আনন্দ পেত খুব।

সেদিনও ত্রসদস্যু একটা ছড়ি নিয়ে কয়েকটা মেষশিশুকে তাড়া করতে করতে একটু জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেছে। সামনে একটা ঝোপের মধ্যে দুটো সিংহের বাচ্চা শুয়েছিল। মানুষের সাড়া পেয়ে তারা বেরিয়ে আসে ঝোপ থেকে। ত্রসদস্যু এই অদ্ভুত জন্তুকে দেখে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তাকেও তাড়া করতে এগিয়ে যায়। সিংহশিশু তখন ছুটে যায় তার মা-বাবা যেখানে রয়েছে। আর ত্রসদস্যুও এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ লোকের নজর পড়ে ওর দিকে।

সকলে হায় হায় করে ওঠে। পুরুজন-এর ভাবী রাজা সাক্ষাৎ যমের মুখে এগিয়ে চলেছে। সকলে যে যার প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ছুটে গিয়ে ত্রসদস্যুকে ধরে আনে।

সেই থেকে ত্রসদস্যুকে সকলে কশোজু বলে ডাকে।

কশোজুর পিসিমা পৌরবী কশোজুর বীরত্বের কাহিনী বার বার শুনেও যেন তৃপ্তি পায় না।

দুই ননদ-ভাজ-এর একটি মাত্র সন্তান। তাই দুজনের অসীম স্নেহ ছিল কশোজুর উপর। এ ছাড়া তাদের কাজই বা কি।

আর্যজন-এর মধ্যে অন্যান্য সাধারণ রমণীর সঙ্গে রাণীর কাজ-কর্ম করবার বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই। তাই পুরুকুৎসানী আর পৌরবী কলসী করে নিজেরাই গরুর দুধ দুয়ে নেয়, দুধ গরম করে, মাখন তোলে, জঙ্গল থেকে গরু-বাছুর হাঁকিয়ে নিয়ে আসা-যাওয়া করে। শুধু তাই নয় গোয়ালের আবর্জনা প্রভৃতি পরিষ্কার করতেও তাদের কোনো বাধা-নিষেধ নেই। যদিও তাদের কাজের লোকের অভাব নেই। সাধারণ আর্য পরিবারেও পণি বা নিষাদ জাতির দাস-দাসী থাকে। আর পুরুকুৎস আর বধ্রযশ্বের কুলের কথা ত নতুন করে বলবারই প্রয়োজন নেই।

আজ পর্যন্ত কোনো আর্য পরিবারে কিলাত দাস-দাসী আসেনি। এবার কিলাত জয়ের পর থেকে প্রায় সকলের ঘরেই কিলাত দাস-

দাসী রাখা শুরু হয়েছে। পুরুকুৎসানীর কাছেও কিলাত দাসী রয়েছে। ওর যেন আশ্চর্য লাগে।

কিলাতদের সাত পুরী ধ্বংসের সময় রাস্তার উপর একটি শিশু পড়েছিল। আর্যসেনার কাছে কিলাতের একটি প্রাণও ক্ষমার অযোগ্য ছিল। সেই মুহূর্তে ঘোড়ায় চেপে পুরুকুৎসানী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শিশুটিকে দেখতে পেয়ে কুৎসানী রাস্তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসে।

এখন তার বয়স আট-নয় বৎসর।

মেয়েটি কশোজুর সঙ্গে সর্বদা খেলাধুলা করত। অবোধ বালিকা এখনো জানেনা তাকে কি নজরে দেখা হয়ে থাকে। কখনো কখনো শ্যামলা বা কালী বলে ওকে চোখ রাঙালে ও ভাবতো যে ওকে পীতকেশের দল থেকে আলাদা ভাবা হয়ে থাকে। শত চেষ্টা করলেও দেহের রঙের কালীন্য ঘোচানো তার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু কিলাত-পুত্রীর উপর পুরুকুৎসানীর বাৎসল্য স্নেহ ছিল। কশোজু আর কালী যখন বিকেলে খেলা করত তখন অশ্বত্থ গাছের নিচেয় বসে কুৎসানী আর পৌরবী বসে গল্প করত।

দেখতে দেখতে বসন্তকাল আসে। গাছে গাছে নতুন পাতার সমারোহ। আর্যদের শরীরে বারোমাস পশমী পোষাক থাকত। তাই শীত গ্রীষ্মের পার্থক্য তেমন ছিল না তাদের কাছে।

সেদিনও দুই ননদ-বৌদী বসে গল্প করছিল। দুজনেই সেজেগুজে বসেছে। ননদ এখনো কিশোরী। ওকে সাজাতে বৌদীর খুব আনন্দ। ওর লম্বা লম্বা বেণী দুটো পিছন দিকের দুটো কাঁধের উপর বেঁধে দেয় পুরুকুৎসানী। পৌরবীর বড় বড় নীল চোখ দুটি আনন্দে চক চক করে। স্নেহভরা দৃষ্টিতে বৌদীর দিকে তাকায়। বৌদী ওর চিবুকে হাত দিয়ে বলে,

—আহা, কি সুন্দর লাগছে তোমাকে।

—হুঁ, তুমি কিসে কম যাও বৌদী। সমস্ত সপ্তসিন্ধুতে তোমার রূপ-লাবণ্যের জয়-জয়কার।

—সেদিন কি আর আমার আছে ভাই? এখন আমি ছেলের মা হয়েছি, তুমি কুমারী রয়েছ।

—জননী হওয়া ত সৌভাগ্যের কথা বৌদী। বিশেষ করে কশোজুর মত সন্তান পাওয়া।

—তুমিও হবে। আর বেশি দেরী নেই।

—তাহলে আমিও পুরনো হয়ে যাব?

—না ভাই, তোমার অমন উর্বশীর মত রূপ অত তাড়াতাড়ি পুরনো হবে না। সত্যিই বভ্রযশ্ব খুব ভাগ্যবান যে তোমার মত উর্বশীরূপা পত্নী পেয়েছে।

—জানি গো জানি। পৌরবী বৌদীকে ঠেলে দিয়ে সরে বসে। উর্বশী কে ছিল তা জানি, যার পিছনে পুরুরাজ পাগল হয়ে থাকত।

—ঠিক তোমার মত। দেখছ না পৌরবী যেখানেই যায় নর-নারী কেমন হন্যে হয়ে ছুটে আসে তার রূপ-সুধা পান করবার জন্য। আর্যনারীর সকল সৌন্দর্য তোমার দেহে উপচে পড়ছে। কোন দিকে দেখব ভেবে পাই না, সোনার বরন কেশ দেখব, না তুঙ্গ নাসিকা। নীল চোখ দেখব, না লাল ঠোঁট দুটি। চন্দ্রখণ্ডের মত কপোল দেখব, না উন্নত শ্বেত কপালের দিকে। শক্তিসম্পন্ন সুধর বাহুলতার দিকে দেখব, না তার কোমল চম্পাকলী আঙ্গুল আর আরক্ত করতল। তাছাড়া বক্ষ, কটি, জানু, জঙ্ঘা, পদতল সব এত সুন্দর যে তোমার সৌন্দর্যের উপমা শুধু তুমি।

—তাই বুঝি আমি দ্বিতীয় উর্বশী? বাঁকা চোখে তাকায় পৌরবী।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে উর্বশী তুমি নও, যে:তার প্রিয়তমকে কাঁদাত।

—আচ্ছা বৌদী, প্রিয়তমের সঙ্গে সে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কেমন করে করত ?

—সে ত মানবী ছিলনা ভাই।

—কিন্তু দানবীও ত ছিলনা! দেবাঙ্গনাদের শ্রেষ্ঠ অপ্সরা ছিল।

—হ্যাঁ ভাই, তোমার মুখে কতবার উর্বশীর গীত শুনেছি। শুনে যেন মত তৃপ্ত হয় না। আর একবার শোনাও না ভাই।

—আমি একলা গাইব না। তুমি যদি সঙ্গে গাও তাহলে পাইতে পারি।

—অর্থাৎ ?

—পুরুরুবার ছন্দগুলি গাইব আমি আর উর্বশীর ছন্দ গাইবে তুমি।

—পাগলী, উল্টো হয়ে গেল। সত্যি সত্যি উর্বশীর গীত আমাকে মানায় না। নারীসুলভ কোমলতা আমার মধ্যে কোথায় ?

—তুমিও উল্টো বললে বৌদী। কোমল সৌন্দর্যের কি দাম আছে ? শৌর্য আর সৌন্দর্যের অপূর্ব মিশ্রণ তোমার মধ্যে। সারা দেশের লোক তাই বলে। তুমিও তা জানো।

—বেশ, শৌর্যের একাধিকারীণী আমিই পুরুরুবার ভাগ নিচ্ছি।

বসন্তের অপরাহ্ন। গরমের প্রকোপ তেমন নেই। দুজনে সুর করে গান শুরু করে। উর্বশী তিন বৎসর যাবত পুরুরুবার কাছে থেকে, সন্তান ভরতকে জন্ম দিয়ে সকলকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। পুরুকুৎসনী পুরুরুবার করুণ কণ্ঠে শুরু করে,—

হে জায়া, হে নিষ্ঠুর একবার এদিকে মন দাও, একটু দাঁড়াও, আমরা দুজনে কিছু কথা বলি। এখন থেকে আমরা যদি মন্ত্রনা না করি তাহলে আমাদের ভবিষ্যতের দিন কেমন করে সুখের হবে ?

উর্বশী ঃ আমার মেয়াদ শেষ হয়েছে। প্রথম উষার মত আমি তোমার কাছে এসেছিলাম। এখন তুমি ফিরে যাও, আমি বায়ুর মত দুর্লভ।

পুরুরুবা ঃ তোমাকে ছাড়া আমাকে আমি যে ভাবতে পারিনা। তূনীর থেকে বাণ-তুলতে পারিনা, যুদ্ধের নাদ করতে পারিনা, শত শত গাভীকে জয় করে আনতে পারিনা, বীর-রহিত কাজ আমার শোভা পায়না।

উর্বশী ঃ হে উষা! ও যদি উর্বশী শ্বশুরের ধন দিতে ইচ্ছা করত তাহলে পাশের ঘর ছেড়ে শয়ন ঘরে গিয়ে দিনরাত আরামে থাকত। হে পুরুরুবা! আমার সঙ্গে কোন সতীনের ঝগড়া বিবাদ ছিলনা, তবুও দিনে কয়েকবার তুমি আমাকে দণ্ড দ্বারা প্রহার করতে। হে সুবীর! আমার ঘরে যখন ছিলে তখন তুমি আমার অভিন্ন অঙ্গ ছিলে।

পুরুরুবা ঃ হে উর্বশী! পুরুরুবা মানুষ হয়ে যখন অমানুষী সেবন করতে গিয়েছিল, তখন হরিণ অথবা রথের অশ্বের মত ভয় পেয়ে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে। মরণধর্মা হয়ে আমি যখন অমৃতার সঙ্গ পাবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলাম তখন তুমি অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলে। তোমার শরীর দেখাওনি, মনে পড়ে? বিজলীর মত আলো করে যে উর্বশী আমার কামনাকে পুরণ করেছিল, আমার জন্য যে সুজাত মানুষ পুত্র জন্ম দিয়েছে সেই উর্বশীর আশির্বাদে সে যেন দীর্ঘায়ু হয়।

উর্বশী ঃ হে পুরুরুবা! তুমি তোমাকে রক্ষা করবার জন্য জন্ম দিয়েছ। তখন সব কিছু জেনে শুনে আমি তোমাকে বলেছিলাম। তখন আমার কথায় তুমি কান দাওনি, এখন ব্যর্থ রোদন করে লাভ কি?

পুরুরুবা ঃ জন্মজাত শিশু যখন তোমার কথা মনে করবে, তোমাকে

কাছে পাবে না, তখন সে অশ্রুপাত করবে। স্নেহযুক্ত পতি পত্নীকে কে বিযুক্ত করবে? তোমার শ্বশুরের ঘরে যে আগুন জ্বলছে তাকে কে নেভাবে?

উর্বশী: সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। ঐ শিশু তোমার কাছে অশ্রুপাত করবে না। আমি তার কল্যাণ করব। তাকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি ঘরে ফিরে যাও। আমাকে তুমি পাবে না।

পুরুরুবা: তুমি না থাকলে আজ পুরুরুবা পড়ে যাবে। সে বহুদূর এসেছে, এখান থেকে ফিরে যাবে না আর। আপদে পড়ে বিনষ্ট হবে, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের মুখেই তার জীবন শেষ হবে।

উর্বশী: না, তুমি মরবে না, আপদ বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না অথবা অশিব জানোয়ার তোমাকে বিনষ্ট করবে না। স্ত্রীজাতির মিত্রতা স্থায়ী হয় না। তাদের হৃদয় অন্তসার শূন্য হয়ে থাকে। মেষএর মত মায়াশূন্য হয়ে থাকে।

দুজনের মধুর কণ্ঠের সুরেলা সুর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভোর হয়ে ওরা গেয়ে চলেছে। দুজনেরই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। পৌরবী নিজের হৃদয়ের বিষাদ মুছে ফেলবার জন্য বলল,—না, না, তা হয়না। মেষ-এর সঙ্গে নারীহৃদয়ের তুলনা করা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা। নারী যাকে একবার হৃদয় সমর্পন করে তাকে জীবন থাকতে ভুলতে পারে না।

(পুরুকুৎসানী পৌরবীর দিকে তাকিয়ে বলে)

—কিন্তু উর্বশী ত মানব কন্যা ছিল না। সে ছিল দেবকন্যা অপ্সরা। দেবলোক ছেড়ে সে কেমন করে আসবে?

—কোনো নারীকে যদি তার প্রেমিক এবং তার বাড়ী এই দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয় তাহলে সে নিশ্চয় তার প্রেমিককে বেছে নেবে।

—না ভাই, দেবলোকে আমাদের মত একান্ত সমর্পণ নেই।

—একান্ত সমর্পণের কথা বলছি না আমি। সমর্পণ উভয় দিক থেকেই হয়ে থাকে। অপর পক্ষ থেকে যদি সে ভাব না জাগে তাহলে সে নারীকে নারী হতে বারণ করব আমি। আচ্ছা বৌদী, উর্বশীর সে পুত্রের কি হল।

—উর্বশীর পুত্র ভরত, তার সন্তান হ'ল ঐ ভরত জন।

—অর্থাৎ আমাদের তৃৎসু জন হ'ল ভরতের সন্তান? ওরা তাহলে অর্দ্ধমানব অর্দ্ধদেব?

—নারে পাগলী, অর্দ্ধ মানব অর্দ্ধদেব কেউ হয় না। তৃৎসু সন্তান সম্পূর্ণ মানব। পুরুরুবাও মনুর সন্তান।

ত্রসদস্যু কিলাতীর সঙ্গে খেলতে খেলতে খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ গানের সুর কানে যেতে ছুটে আসে ওদের কাছে। মায়ের কাছে না গিয়ে আগে পিসিমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—আর একটু গাও না। ওর আগ্রহকে অস্বীকার করতে পারে না পৌরবী। অথচ ঐ বিয়োগ গাথা আবার গাইবার মত মনের অবস্থাও ছিল না। গাইবার আগে বৌদিকে বলল পৌরবী,

—বৌদী! এর নাম অর্দ্ধদেব রাখলে কেমন হয়?

—কত নাম রাখবে? ত্রসদস্যু, কশোজু প্রভৃতি নাম কি খারাপ?

—না, তবুও ওকে অর্দ্ধদেব বলে ডাকতে ইচ্ছা করছে। আমি আজ থেকে ঐ নামেই ডাকব।

—তাই ডেকো। তোমাকে কে মানা করবে?

ত্রসদস্যুর বার বার অনুরোধে পৌরবী আর একবার উর্বশী পুরুরুবার বিরহ রাগ গীতি গেয়ে শোনাল।

তারপর আরো অনেক দিন কেটে গেছে।

সেদিন পৈজবন কুলে (আর্য জন বা কুল-এর নাম) আনন্দের

বান ডেকেছে। বৃদ্ধ ঋত্বিজ বিরাট হোমকুণ্ডের সামনে বসে ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র-সোম, ইন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তুতি করছেন। স্ত্রীরা মধুর কণ্ঠে মঙ্গল গীত গাইছে। চারিদিকে আনন্দ, ধুম-ধাম।

বধ্রযশ্ব আজ প্রথম পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। তাই আর্য পৈজবন কুলে এত আনন্দ অনুষ্ঠান।

কশোজু-কে সঙ্গে নিয়ে পুরুকুৎসানী অনেকক্ষণ এসে পৌঁছেছে। পুরুকুৎস পরে এসেছে। বালক ত্রসদস্যু এত ধুম-ধাম দেখে অবাক না হয়ে পারে না। ঘুরে ঘুরে আনন্দের কারণ জানবার চেষ্টা করছে। পুরুকুৎসানী ওকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করছে—তোমার ভাই হয়েছে। কিন্তু এত অল্প কথায় কশোজুর মন তৃপ্ত হয় না। তাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উত্যক্ত করে তোলে,—কোথায় আমার ভাই। কোথা থেকে এসেছে, দেখাও আগে, প্রভৃতি।

ত্রসদস্যু ছোট বেলা থেকে খুব মন দিয়ে ইন্দ্রের মহিমা কীর্তন শুনত। ইন্দ্রের উপর তার ভক্তি শ্রদ্ধা খুব। সেই ইন্দ্র তার জন্য ভাই পাঠিয়েছে। আর কিছু তার জানবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অধীরতা ত কমে না বরং বেড়ে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে ভাই সামনে আসতে ত্রসদস্যুর আনন্দ যেন ধরে না, ও প্রথম দর্শন করল। সাদা গোলগাল চেহারা দেখে ওর যেন তৃপ্তি হয় না।

নবজাত শিশুর চোখ বন্ধ ছিল। ত্রসদস্যু ভাবল ওর বোধ হয় চোখ নেই। কিন্তু মা আর পিসি যখন বার বার বলতে লাগল—'তুমি যখন মহান ইন্দ্রের কাছ থেকে এসেছিলে তখন তোমারও চেহারা অমনি ছিল।" তবে ত্রসদস্যুর কিছুটা সন্তোষ হয়।

স্বরস্বতী নদীর তীরে ত্রসদস্যু নবজাত শিশুর খোলা চোখ দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। শিশুর চোখদুটি ওর মায়ের মতই নীল। কিন্তু ত্রসদস্যুর মা ছিল সুবর্ণাক্ষী।

নদীর তীরে লোক ধরেনা। আচার অনুষ্ঠানের পর নবজাত শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান শেষ হল। সর্বসম্মতিক্রমে শিশুর নাম রাখা হল দিবোদাস।

ত্রসদস্যুর আর কোনো চিন্তা নেই এখন। দিনের মধ্যে পঞ্চাশ-বার এসে "দিবোদাস" "দিবোদাস" বলে ভাইকে ডাকা আর আদর করা। কিন্তু বেচারা দিবোদাস ওর কথা কিছুই বুঝতে পারে না। ভয়ে ওর কাছে কেউ শিশুকে দিতে চাইত না, কিন্তু কিলাতীর কোল থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে ত্রসদস্যু ওর বাৎসল্য প্রকাশ করত। ভাইকে কোলে করে ও বলত,—দিবো, তুমি তাড়াতাড় বড় হয়ে যাও, তাহলে সবসময় দুজন মজা করে খেলতে পারব। মাঠে গিয়ে বাছুর ধরে তার মুখে লাগাম লাগিয়ে তার পিঠে চড়ব। তুমি ভয় পেওনা, ভাই! আমার মা খুব বড় ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে তীরের মত ছোটায়। অতবড় ঘোড়ার পেট ছুঁতে পারিনা আমি, মা কেমন চমৎকার একলাফে তার পিঠে চড়ে যায়। আমাদের বাছুর আমাকে চেনে, তার পিঠে চড়লে সে কিছু বলবে না। বুঝলে ভাই?

দিবোদাস "গুঁ" শব্দ করে উঠতে ত্রসদস্যু ভাবে দিবোদাস "হ্যাঁ" বলছে। ত্রসদস্যু আবার বলে,—তুমি বড় হয়ে কি রঙের ঘোড়া পছন্দ করবে? লাল না সাদা? না, আমাদের দুজনের ঘোড়ার রং এক হবে। দিবোদাস আবার "গুঁ" শব্দ করে। ত্রসদস্যু তার কথার রেশ টেনে বলে,—ঠিক বলেছ ভাই। আমাদের দুজনের ঘোড়ার রঙ এক হওয়া চাই। পুরুদের কাছে খুব ভাল ভাল ঘোড়া আছে, আমি আমার মনের মত পছন্দ করব। আমরা যখন ছোট থাকব তখন বাচ্চা ঘোড়া বেছে তার পিঠে চড়ব। তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। তারপর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সেও বড় হবে। তখন কি মজা হবে।

তুজনের মা দূর থেকে ওদের কথাবার্তা শোনে। কিন্তু কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করে না ওদের প্রাণখোলা আলোচনায়।

এমনি করে দিন কাটতে থাকে।

ত্রসদস্যু আর দিবোদাসের গল্পের শেষ হয় না।

পৌরবী আর পুরুকুৎসানীর মনের কথাও ফুরোয় না।

তারপর একদিন এলো—যখন পুরুজন উত্তর দিকে চলে যায়। তৃৎসুরাও পশ্চিম দিকে যাবার প্রস্তুতি শেষ করে।

কিন্তু স্বরস্বতীকে ছেড়ে যেতে কারো মন চায়না। এই স্বরস্বতী ওদের বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে, ওদের সন্তান দিয়েছে। তাই স্বরস্বতীর তীরে হোম-পূজা করবার সময় সকলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে,—মাতা স্বরস্বতী! তোমার উপকার আমরা কখনো ভুলব না। তোমারই করুণায় আমরা দিবোদাসকে পেয়েছি, সে তোমারই সন্তান, তাকে রক্ষা করা তোমার কাজ। দিবোদাস যেন তার পিতৃকুল পৈজবন কুলের গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে, তাকে তেমনি যোগ্য করো।

বিদায়ের আগের দিন ভরতজাতির পক্ষ থেকে বিরাট ভোজ অনুষ্ঠান হয়। শত শত বৃষভ রান্না হয়, সোম-এর ত মাপ-জোপ নেই। বিকেল থেকে শুরু হল নাচ গান আর পান-ভোজন। শেষ হতে পূবদিক ফর্সা হয়ে এসেছিল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃৎসুদের যাত্রা শুরু হয়। ভরত জন অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে বিদায় দিয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের যাবার পথের দিকে।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত তৃৎসুদের ছেড়ে যাওয়া জায়গার দিকে তাকিয়ে ভরতজন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

এমনি যাযাবর জীবন ছিল আর্যজাতির।

চিরকাল এক জায়গায় থাকা ওদের জননীতির বাইরে। তাই সংযোগ বিয়োগ ওদের নিত্যকালের সঙ্গ-সাথী। কিন্তু অতিথি-

পরায়ণতা আর বন্ধু-প্রেম একাধিকবার একের সঙ্গে অপরের মিলনে সহায়তা করত।

স্বরস্বতীর তীরে একবছর থাকবার পর ভরত জন বুঝতে পারে ওপারের পণি-জাতির দিক থেকে ভরত জন আক্রান্ত হবার আর কোনো ভয় নেই। তাই নদীর তীরের পাহারা তুলে দেওয়া হল।

স্বরস্বতীর ওপর পৈজবন কুলের অপার শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। আজ কুড়ি মাস হল ওরা স্বরস্বতীর তীর ছেড়ে এসেছে। কিন্তু তৃৎসুজন-এর মাতৃস্থানীয়া ছিল পরুষ্ণী বা রাবী নদী। তাই স্বরস্বতীকে ওরা স্নেহময়ী মাসী বলে ভক্তি করত। কিন্তু মুখে কখনও প্রকাশ করেনি। তাহলে হয়ত স্বরস্বতী রুষ্ট হবেন।

কিন্তু কোথায় স্বরস্বতী আর কোথায় রাবী। দুই বোনে অনেক পার্থক্য। রাবীর ধারা শীতের সময়ে যেমন বিশাল থাকে, গরমের সময়ে আরো বিরাটরূপ ধারণ করে। এমনি বারোমাস দুকুল ভরা থাকে। রাবীর স্বচ্ছ জলের তলায় বালুকণা চিকমিক করে। রাবীর বুকে সাঁতার কাটার আনন্দের তুলনা হয়না। স্বরস্বতীর ক্ষীণ ধারাকে লাফ দিয়ে পার হওয়া যায়, কিন্তু রাবীর বুকে সাঁতার কেটে পার হতে যেমন পরিশ্রম করতে হয় তেমনি সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়।

বধ্রযশ্ব জানত রাবীর উপর দেবরাজ ইন্দ্রের খুব কৃপাদৃষ্টি আছে। উষাদেবীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে একদিন ইন্দ্র তাঁর রথের চাকা রাবীর তীরে ফেলে দিয়েছিলেন।

স্বরস্বতীর তীরে যখন হাজার হাজার গরু ভেড়া জল খাবার জন্য জমা হত, তখন মনে হত ওরা বোধ হয় সবটুকু জল খেয়ে শেষ করে ফেলবে। কিন্তু রাবীর কাছে সে ভয় নেই।

দীর্ঘদিন পর রাবীর অতল জলের পরশ পেয়ে রাজা বধ্রযশ্বের মনে বিচিত্র আনন্দের সৃষ্টি হয়।

তৃৎসুজন যখন স্বরস্বতীর তীর ছেড়ে চলে আসে, দিবোদাসের

তখন মাত্র ছ-মাস বয়স। তাই স্বরস্বতীর কোনো স্মৃতি দিবোদাসের মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু মা পৌরবী স্বরস্বতীর উপর ভীষণ কৃতজ্ঞ। তাই সর্বদাই দিবোদাসের কানে বলতো,—দিবো, স্বরস্বতী তোমার মা, তিনিই তোমাকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া স্বরস্বতীর বিষয়ে অনেক গীত, স্তোত্র মা দিবোকে শিখিয়েছিল। দিবো সেগুলি সুর করে গাইত। তাই দিবোদাসের জীবনে স্বরস্বতীর স্মৃতি নদীর বদলে দেবীর আসন পেয়েছিল।

মাতুলপুত্র ত্রসদস্যু বছরে এক-দুইবার মায়ের সঙ্গে পৈজবন জনপদে বেড়াতে আসত। কিছুদিন থেকে আবার ফিরে যেত। ততদিন ওরা দুজন একই সঙ্গে খেলাধুলা করত বটে কিন্তু বয়সে ওরা ছিল সাত বছরের ছোট বড়। তাই ঠিক সমবয়সীর মত সখ্যতা জমে উঠতে পারেনি, কিন্তু দুজনের মধ্যে স্নেহ-প্রীতি ছিল অসীম।

ত্রসদস্যু মাত্র পাঁচ বছর বয়সে কশোজু উপাধি পেয়েছিল। দিবোদাসও ঐ বয়সে কম যায়নি। সর্বদাই তাকে তার সমবয়সীদের চেয়ে দু বছর বড় মনে হত। শুধু আকৃতিতে নয় সাহসে এবং প্রতিভায় সে সকল সমবয়সীদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ছিল। সেজন্য পৌরবীর গর্বের সীমা ছিল না। যেমন যেমন দিবোদাসের শরীর বাড়তে থাকে তেমনি তার মায়ের দেবতাদের উপর ভক্তি বাড়তে থাকে।

দিবোদাসের জন্মের তিন বছর পর তার আর এক ভাই জন্ম নেয়। তার নাম রাখা হয় সুমিত্র। দিবোদাসের মত সুমিত্র তার মায়ের স্নেহ সমানভাগে ভাগ করে নিতে পারেনি। হয়ত তার কারণ ছিল দিবোদাসের অপূর্ব সুন্দর চেহারা এবং প্রতিভা।

দিবোদাস আর ত্রসদস্যু একসঙ্গে বাচ্চা ঘোড়ায় চড়তে পারেনি। তবে দিবোদাসের খুব সখ ছিল। তাই একদিন একটা বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে চেপে কিছুদূর যেতেই পড়ে গেল কিন্তু তাই বলে তার সখ মিটল না এবং তার ঘোড়ায় চাপা বন্ধ হয়নি কখনো।

দুই চোখে যা দেখবে তার জন্য জিদ করা ছিল দিবোদাসের স্বভাব। পিতা বধ্রযস্বকে যোদ্ধার পোষাক পরতে 'দেখে দিবোদাস জিদ ধরল সেও এরকম পোষাক পরবে। ফলে তার পিতাকে দিবোদাসের জন্য ছোট শিরস্ত্রান, ধনুক, তরবারী তৈরী করে দিতে হল।

বধ্রযশ্ব যদিও পুরু জনের মুখ্য জননায়ক ছিল না কিন্তু সমগ্র আর্য জনের মধ্যে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশি। সপ্তসিন্ধুর সকল আর্যজনের মধ্যে তার সমাদর ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন কুশল সেনানায়ক ছিল তেমনি সকল জন'এর সমৃদ্ধির জন্য এবং নিজেদের মধ্যে দলাদলি বা ঝগড়া মেটাবার জন্য সর্বদা তার চেষ্টার অন্ত ছিল না।

তৃৎসু এবং পৈজবন প্রথমে তেমন সমৃদ্ধ ছিল না। রাবীর তীরে ওরা যেখানে বাস করত সেখানকার বহুদূর বিস্তৃত অরণ্য ওদের পশু সংখ্যা বাড়িয়ে ওদের সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বধ্রযশ্বের নিজের বহুমুখী প্রতিভা এবং সদগুণ যদি না থাকত তাহলে সপ্তসিন্ধুর আর্যদের উপর অতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। এর জন্য কখনো কখনো প্রতিবেশীদের ঈর্ষাও হত।

পুরুরা চাইত না যে আমাদেরই এক শাখা ( তৃৎসু ) জাতি আমাদের সঙ্গে সমানতার দাবা করুক। তাছাড়াও আর্যদের অন্যান্য শাখা যেমন, তুর্বসু, যদু, অনু, দ্রুহ্য প্রভৃতি জাতিরাও তৃৎসুজনকে এবং তাদের রাজাকে পুরনো দৃষ্টিতে দেখতে চাইত। তারাও তৃৎসুজন-এর এতখানি সমৃদ্ধিকে বেশ ঈর্ষার চোখে দেখত।

কিন্তু বধ্রযশ্ব তাদের এই মনোভাবকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দেয়নি। যদি বধ্রযশ্ব তার যুদ্ধ কুশলতার অভিমান করত তাহলে হয়ত প্রতিবেশী সকলের কোপদৃষ্টিতে অবশ্যই পড়তে হত। কিন্তু বধ্রযশ্ব সকলের সঙ্গে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে মেলামেশা করত যে

সকলেই ওর বন্ধু ছিল। ইচ্ছা থাকলেও কারো মুখ ফুটে কিছু বলবার ছিল না।

তৃৎসু জনপদে অন্য যে কোনো জাতি সসম্মানে আহ্বায়িত হত। আর্যজনের শত শত অতিথি প্রতিদিন ওদের সঙ্গে পান ভোজন করত। নিজের স্বাভাবিক গুনের জন্য শত্রুকে এক মুহূর্তে বন্ধু বলে আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বধ্রযশ্বের।

দিবোদাস পিতার এই জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তার প্রতিভা আর আচার ব্যবহার দেখে সকলে বিস্মিত হয়।

শীতের সময় বধ্রযশ্বের গোত্র উত্তর দিকে এমন এক জায়গায় গিয়ে তাদের আস্তানা ফেলত যেখান থেকে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত খুব কাছাকাছি। গত কয়েক বৎসর যাবত দিবোদাস পর্বত দেখেনি, দেখার অবসরও হয়নি। এবার এখানে এসে এখানকার সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করে পিতাকে। ভরত ভূমিতে পর্বত ছিলনা, মাতুল ভূমির উত্তর দিকে যদিও পর্বত ছিল কিন্তু তা দেখার সৌভাগ্য দিবোদাসের হয়নি। প্রথম প্রথম হিমালয়কে দেখে দিবোদাস ভাবত ওগুলি বোধ হয় মেঘ। কিন্তু মা সে প্রশ্নের নিরসন করে দেয়,—ওগুলি মেঘ নয় বাছা, পর্বত। মেঘ তৈরী হয় জল দিয়ে, আর পর্বত তৈরী হয় পাথর দিয়ে।

এর পর প্রতি বছরে পর্বতের পাদদেশে যেতে হত। সেখানে গিয়ে বার বার মনে হত ঐ পর্বতের মধ্যে গিয়ে বেড়িয়ে আসে। কিন্তু পিতা-মাতা নানাপ্রকার ভয় দেখিয়ে নিষেধ করত।

দিবোদাস ঠিক বুঝতে পারত না ওখানে ভয়ের কি থাকতে পারে। সকলে বলে ঐ পর্বতের পিছনে দেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা থাকে। দেব'রা ত তাদের খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আর ভক্তদের রক্ষা করাই ত দেবদেবীর কাজ। তবে মা কেন বলে ওখানে পিশাচ থাকে?

তারা মানুষ ধরে খায় ! বহুদিন এইচিন্তা দিবোদাসের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত পিশাচ কি জিনিষ। আর্যজাতির সকল মানুষকে ও দেখেছে। তাছাড়া কালো পণি, নিষাদ, কিলাত প্রভৃতি সকল জাতিকে দেখেছে। পিশাচরা নাকি মানব নয়, তাই তাদের আকার কেমন মনের মধ্যে চিত্রিত করতে পারত না। তাই পিশাচ দেখবার অদম্য ইচ্ছা রইল দিবোদাসের মনে।

মাতা পিতা ওকে নির্ভীক করে গড়ে তুলবার জন্য ভয় কি জিনিষ তা জানতে দিত না। এই শিশু বয়সে যদিও মৃগয়ায় যাবার সুযোগ হত না, কিন্তু নিজের ছোট ধনুর্বান নিয়ে প্রায় সময় ঘুরে বেড়াত। যদি কোথাও কোনো শিয়াল প্রভৃতি ছোট জানোয়ার ভুলক্রমে দিবোদাসের নজরে এসে পড়ত তাহলে তার আর রক্ষা নেই। ওর অদ্ভুত লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয়নি। যদিও ওর তীরের ফলা তেমন তীক্ষ্ণ থাকত না বা ধনুক তেমন শক্ত নয় তবুও নিজের সফলতার উপর নিজে খুব গর্ব অনুভব করত।

## ॥ তিন ॥

"ধম্বনা গা ধম্বনাবিং জদেয়"

[ সময় খৃঃ পূঃ ১২০৫ ]

বসন্ত ঋতুতে রাবীর জল নীল মনে হয়। ধারা যদিও বর্ষার সময়কার মত তেমন তীব্র আর বিস্তৃত নয়, তবুও যথেষ্ট চওড়া। দুই তীরে তার বহুদূর পর্যন্ত বালুকাবেলা। তারপর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, তারপর ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলের মধ্যে এক ক্রোশ চওড়া আর এক যোজন লম্বা জায়গা পরিষ্কার করে বিরাট মাঠ তৈরী করা হয়েছে। প্রতি বৎসর তৃৎসু জনের এই জায়গাটি দরকার হয়।

প্রতি বৎসর ওদের বার্ষিক মেলা "অশ্ব সমন" বা অশ্বমেলা এখানেই হয়ে থাকে। এখানে সকল পুরু সম্বন্ধী আর্য জন এবং পুরনো পঞ্চ জাতির বাকী চার শাখা যদু, তুর্বশ, অনু, দ্রুহ্য প্রভৃতির সমাবেশ হয়ে থাকে।

ছোট হোক অথবা বড় হোক, আর্যজন যেখানেই থাক তাদের গবাদি পশুধন সঙ্গে থাকে। এই তাদের জীবিকা, তাদের পাথেয়। এরই বিনিময়ে তারা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র পেয়ে থাকে।

এ বৎসর অশ্বমেলায় রাজা বধ্রযশ্ব সপ্তসিন্ধুর সকল আর্যজনকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। মেলার জায়গা যদিও আগের মতই রয়েছে, কিন্তু বহিরাগত সকলে জঙ্গলের বহুদূর পর্যন্ত তাদের তাঁবু ফেলে থাকবার ব্যবস্থা করেছে।

এই মেলার উদ্বোধন হত সকালে—উপস্থিত সকল জননেতাকে নিয়ে একত্রে হোমাহুতি ও সকলের সমৃদ্ধি কামনা করে। তারপর কোথাও বা মল্লযুদ্ধ, কোথাও মুষ্টিযুদ্ধ, কোথাও রথের প্রতিযোগিতা, কোথাও বা তরুণ তরুণীর নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা।

ভোর বেলায় উষার বন্দনার সময় সকল তরুণ তরুণীদের ঘুম ভাঙ্গত না, তবুও উপস্থিত জনের সংখ্যাও নিতান্ত কম হত না। সকল আর্যজন জানত এই রাবী নদীর তীরে এইখানে ইন্দ্র উষা দেবীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে উষার রথের চাকা ফেলে দিয়েছিলেন। তাই এই জায়গা সকল আর্যের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। আর উষাও তার ভগ্ন চাকার জন্য এই জায়গাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন।

সূর্যের লোহিত বরণ গোলার্দ্ধ চোখে পড়তেই চারিদিকে সবিতার স্তুতিগানে গুঞ্জন করে উঠত। জনপদের এক কোন থেকে অন্য কোণে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরত সেই শব্দ। তারপর প্রত্যেক কুলের নায়ক তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা মশাল জ্বালিয়ে হোম শুরু করত। অগ্নির প্রার্থনা করত। অতঃপর অগ্নিদেবের জন্য উৎসর্গীকৃত পুরোডাশ এবং সোম'এর যজ্ঞশেষ সকলে মিলে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করত। আরপর যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ত।

পশুদের চরবার জন্য জঙ্গলে বিরাট বেড়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এখানে অসংখ্য পশুদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের পশু মিশে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই যে যার পশুর নিতম্বদেশে নিজ নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করে রাখত।

আর্যজাতির সকল পশুই খুব বলিষ্ঠ এবং বড় হত, তার মধ্যে বিশেষ করে কুশিক এবং ভরত জাতির গরু ছিল খুব প্রসিদ্ধ। ছিল পখতো, ভলানসো, গান্ধারী এবং অলিন। এদের ঘোড়া আকারে এত বড় হত যে না-দেখা পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করত না।

এই ঘোড়ায় চড়ে অন্য কোনো দেশে গেলে তাকে দেখবার জন্য লোকের ভীড় লেগে যেত।

সমগ্র সপ্তসিন্ধুর আর্যদের নিজস্ব এই মেলা। তবে সপ্তসিন্ধুতে শুধু আর্যজাতিই বাস করে না। বহু অনার্য জাতির স্থায়ী নগর বা গ্রাম রয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ পীতকেশী আর্যের কাছে তার চেয়ে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ধনী অনার্যকে মাথা নিচু করে চলতে হত। শুধু চলতে হত বললে ভুল বলা হবে, বিনা কারণে তাকে রাস্তায় মারধর করলেও তাদের মাথা উঁচু করে কিছু বলবার উপায় নেই। কারণ তারা সকলে আর্যজাতির শাসনাধীন।

আর্যজাতি পণিজাতি থেকে খুব আলাদা হয়ে বাস করত। পণিজাতি এক এক ঋতুতে এক এক রকম পোষাক বদলে ব্যবহার করত। গরমের সময়ে তারা সূতীর বস্ত্র ব্যবহার করত যা আর্যরা খুবই ঘৃণার চোখে দেখত। শীতের সময়ে তারা গান্ধারী ভেড়ার কোমল পশমে তৈরী কঞ্চুক পরতো।

পণিজাতির অধিকাংশ খুব গরীব এবং নিরীহ ছিল। বিশেষ করে পণিদের এক বিরাট অংশ আর্যজাতির কুলে দাস-দাসী হয়ে থাকত। তাদের অবস্থা পশুর চেয়ে ভাল ছিল না। যে কোনো ধনী পণির ধনসম্পত্তি জোর করে ছিনিয়ে নেবার অধিকার আর্যদের ছিল। তবে তেমন সর্বনাশ তারা করত না। তাহলে পণি তাদের ব্যাপার-ব্যবসা হয়ত ভয় পেয়ে বন্ধ করে দেবে এবং তাতে অসুবিধায় পড়তে হবে সকলকে। পণিদের সাথে ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হত তাদের প্রভু জাতি অর্থাৎ আর্যরা।

আর্যরা যদিও তাদের জীবিকার জন্য পশুপালন এবং যুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিল। কিন্তু অলঙ্কার ব্যবহার করবার রীতি ছিল তাদের মধ্যে যথেষ্ট। বিশেষ করে রাজা, রাণী, রাজকন্যা প্রভৃতি রাজপরিবারে সকলে মনি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার পরতেন। পণিদের

তৈরী সোনার তার দিয়ে সেলাই করা বা মনি-মুক্তা বসানো সোনার দ্রাপী খুব বিখ্যাত ছিল। আর্যনারী অলঙ্কার পরতে খুব ভালবাসত কিন্তু ব্যবহার করবার সৌভাগ্য খুব কম জনের হত।

আভূষণ ছাড়া ধাতুর তৈরী পাত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, নানাপ্রকার পোষাক, এবং আরো বহুপ্রকার সখের জিনিষ পাওয়া যেত পণিদের কাছে। অবসর মত পণিদের একটু আধটু সাহায্য করতে হত নইলে নিজেদের অসুবিধায় পড়তে হত।

আর্যরা যদিও নিজেদের জাতীয় ভোজন ও পরিধান পছন্দ করত, কিন্তু সময় মত স্বাদ বদল করবার জন্য পণিদের ভোজনে ভাগ বসাতে দ্বিধা করত না।

এখানে অশ্বমেলায় শুধু অশ্বই আসেনি, মানুষের প্রয়োজনীয় সকল জিনিষপত্রের যথেষ্ট আমদানী হয়েছে।

পণিদের বাজারে তাই অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে অনেক ভোজনাগার খোলা হয়েছে। সেখানে নানাপ্রকার ভোজন সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। এখানেই সবচেয়ে সুস্বাদু এবং মূল্যবান সুরা পাওয়া যায়। আর্যরা সুরাপানে অপটু নয়। তাদের সবচেয়ে প্রিয় সুরা হ'ল সোম ( ভাং)। এই সোম তৈরী করতে আর্যনারী যেমন পটু ছিল তেমন পণিরা ছিল না। সুরা এবং সোম-এর মধ্যে এতখানি পার্থক্যের কারণ বোধ হয় সুরার বিস্বাদ এবং অল্পমাত্রায় অধিক নেশা। সুরার কটু স্বাদ অবশ্য কিছুদিন অভ্যাস করবার পর অভ্যস্ত করে নেওয়া যায়, কিন্তু মধু এবং ক্ষীর মিশ্রিত সোম-এর জন্য কোনো অভ্যাসের প্রয়োজন ছিল না।

এক কথায় সোম ছিল স্বাদে ও কাজে অদ্বিতীয়।

আর্যরা নিজেদের ধন কখনো বিক্রি করত না। বিশেষ করে আর্যদের মধ্যে তার কখনো দরকার হত না।

পণিদের কাছ থেকে কোনো কিছু কেনা-কাটার সময়ে আর্যরা

গরু, ভেড়া কিছুই নিয়ে যাবার দরকার মনে করত না। কোনো লম্বা যাত্রার সময়ে যখন বেশি সামগ্রীর দরকার হত তখন হয়ত বিনিময় করতো বাধ্য হয়ে।

অন্যান্য সময়ে কোনো পণ্য বা সৌখীন সামগ্রীর দরকার হলে আর্যরা তাম্রখণ্ডের বিনিময়ে সেগুলি পণিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করত। এই সব তাম্রখণ্ডের ওজন এবং মূল্য নির্দ্ধারিত করা থাকত।

পণিরা প্রথম মূল্য নির্দ্ধারণ প্রথা চালু করে। তাদের কাছ থেকে আর্যরা শিখে নেয়।

সংখ্যা ক্রমের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে দশ থেকে গণনা করা হত। প্রথমে এক থেকে দশ, তারপর দশকে গুণ করে কুড়ি, ত্রিশ, শত, সহস্র অবধি গণনা করবার নিয়ম ছিল আর্যদের মধ্যে।

কিন্তু পণিদের ছিল দ্বিগুণ, চতুর্গুণ থেকে ষোল এবং ষোল থেকে তাদের গণনা এবং মাপের হিসাব ছিল। এক পোয়া, আধ পোয়া প্রভৃতি হিসাবও আর্যরা এই পণিদের কাছেই শিখেছিল।

সংখ্যাতত্ত্বের জন্যও পণিদের উপর আর্যদের আকর্ষণ একটা বিশেষ কারণ ছিল।

ত্রসদস্যু এবার উনিশ বৎসর বয়সে পা দিল।

এমনি মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে যাওয়া আসার অভ্যাস ছিলই, তারপর নিজের পিশিমার জনপদের পক্ষ থেকে এতবড় মেলা বসেছে সেখানে না এসে পারা যায় না।

ত্রসদস্যুর পিতা পুরুকুৎস তার ভগ্নিপতি বধ্রযশ্বের দেশজোড়া সন্মানের জন্য মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। পুরুকুৎস নিজেকে পুরুজন-এর রাজা এবং সপ্তসিন্ধুর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে মনে করত।

কিন্তু পুরুকুৎস লক্ষ্য করেছে, লোকের মনে তার চেয়ে বধ্রযশ্বের সম্মান নেহাত কম নয়।

বভ্রযশ্ব যদি সমস্ত জাতির মধ্যে মিত্রতার সম্বন্ধ যুক্ত করে না রাখত তাহলে এতদিন নিশ্চয় শ্যালক ভগ্নিপতীর মধ্যে দু-একটা যুদ্ধ হয়ে যেত।

বভ্রযশ্ব যেমন দিবোদাসকে প্রাণাধিক স্নেহ করত ঠিক তেমনি পুরুকুৎসের সন্তান ত্রসদস্যুকে স্নেহ করত।

ত্রসদস্যু এখন বয়সে তরুণ। রাজকুমারের শিক্ষনীয় শিক্ষা প্রায় শেষ করে ফেলেছে।

কিন্তু দিবোদাসের বয়স মাত্র বারো।

শরীরের দিক দিয়ে যত বলিষ্ঠই হোক না কেন বয়সে দিবোদাস বালকের পর্যায়ে রয়েছে।

ত্রসদস্যু সর্বদা দিবোদাসকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করত।

দুজনের ঘোড়ায় চড়বার ভীষণ সখ ছিল। ওরা শুনতে পেল পখ্‌ত (পাঠান) জাতির ঘোড়াগুলি খুব বেগবান ও বলিষ্ঠ হয়।

তাই একদিন দুই ভাই মিলে একজন পখ্‌ত সরদার-এর আবাস খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল।

ক্রোশের পর ক্রোশ লম্বা আবাসভূমি। নানাজাতির, নানা-দেশের শত শত সরদারের তাঁবু পড়েছে। তার মধ্যে পখ্‌ত সরদারের আবাস খুঁজে বের করতে খুব বেগ পেতে হল না।

লাল রঙের সুন্দর দুটি ঘোড়ার পিঠে চেপে দুজনে পখ্‌ত ছাউনিতে গিয়ে উপস্থিত হয়। পৌঁছে একটা ঝোপের সঙ্গে নিজেদের ঘোড়া বেঁধে রাখে। দুজনেরই বেশ-ভূষায় চিনে নিতে কষ্ট হয় না এরা উচ্চবর্গের রাজকুমার।

সম্মান প্রদর্শনের বেলায় আর্যদের মধ্যে অন্য জাতির চেয়ে সমানতা ছিল বেশি। বয়োকনিষ্ঠ রাজকুমার বয়োজ্যেষ্ঠ একজন বৃদ্ধকে দেখলে সম্মান প্রদর্শন করত।

ত্রসদস্যু আগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে এটা পখ্‌ত সরদার রোহিদশ্বের আবাসস্থান।

রোহিদশ্ব কুমার যুগলকে আসতে দেখে ওদের স্বাগত জানান। ত্রসদস্যু এগিয়ে গিয়ে তাকে অভিবাদন করে নিজেকে কুৎসপুত্র ত্রসদস্যু ও বধ্র্যশ্ব কুমার দিবোদাসের পরিচয় দেয়। আনন্দে উৎফুল্লিত রোহিদস্ব ত্রসদস্যুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে কপাল চুম্বন করেন এবং দিবোদাসকে কোলে তুলে বার বার তাকে চুম্বন করেন আনন্দ প্রকাশ করে।

—আর্য! আমরা আপনার দর্শনের জন্য এসেছি। বলল ত্রসদস্যু।

—কুমার! আমরা এই পৈজবনের অতিথি। সর্বান্তকরণে বলছি ভ্রাতা বধ্র্যশ্ব আমাদের সুখ সুবিধার সব রকম ব্যবস্থা করেছেন। এখানে আমাদের গরু, ঘোড়া ঠিক তেমনি মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছে যেমন আমাদের দেশে পখ্‌ত ভূমিতে ওরা চরে বেড়াত। আমাদের নর-নারীও এই তৃৎসু ভূমিতে নিজের ভূমির মতই স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছে।

—তাহলে আর্য, পখ্‌তভূমিও কি ভরতভূমির মতই?

রোহিদশ্ব এক কথায় ত্রসদস্যুর উত্তর দিয়ে শেষ করেন। বেশি কথা বাড়ানো তার ইচ্ছা নয়।

অতঃপর ওদের দুই ভাইয়ের হাত ধরে নিজের পর্ণশালায় নিয়ে যান। পর্ণশালা মাত্র কয়েকদিন আগে তৈরী হয়েছে। এখনো পর্যন্ত তার গাছ ও পাতার রং সবুজ রয়েছে।

ঘরের মধ্যে পৌঁছাতে রোহিদাশ্বের পত্নী, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও এক কন্যা ওদের স্বাগত জানায়।

ত্রসদস্যু রোহিদশ্ব পত্নীর চরণস্পর্শ করে নিজের নাম গোত্র উচ্চারণ করে প্রণাম ও পরিচয় দান করে।

দিবোদাসও তার অগ্রজের অনুগমন করে।

রোহিদশ্বপত্নী উভয়ের উভাঘ্রাণ (কপালে চুম্বন করা) করে আশির্বাদ করেন। রোহিদশ্ব এবার তুই ভাইকে কম্বলের উপর বসতে অনুরোধ করলে ওরা বসল। তারপর একে একে কয়েকজন বিশিষ্ট পখ্‌ত পুরুস এসে আসন গ্রহণ করে।

ত্রসদস্যু এবং দিবোদাস জানত যে এই পখ্‌ত জাতি তাদেরই মত আর্যজাতি। এদেরও চুল সোনালী রঙের। এদের সকলেরই চোখ নীল। কারো কারো চুল আবার রূপোলী রঙের।

উপস্থিত নরনারী সকলেই বিশিষ্ট নেতা বা নেতৃস্থানীয়।

পখ্‌ত জাতি পুরু জাতির চেয়ে দীর্ঘকায় হয়ে থাকে, একথা ত্রসদস্যু বা দিবোদাস জানত না। এরাও পুরুদের মত অধোবস্ত্র, দ্রাপি এবং মাথায় উষ্ণীষ ব্যবহার করত। তবে পুরুদের মত এদের পোষাকে অত জাঁকজমক নেই। এমন কি রোহিদশ্বের শরীরের পোষাকের কোথাও একটি সোনার তারের সেলাই বা কাজ করা নেই। মাথার উষ্ণীষও শুধু সাদা রেশমী কাপড় জড়ানো ছাড়া অন্য কোনো আড়ম্বরতা স্থান পায়নি।

রোহিদশ্বের বয়স প্রায় পঞ্চাশ।

লম্বা দাড়ীর হলুদ রঙের কোথাও কোথাও সাদা আভা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার সুপুষ্ট স্বাস্থ্য দেখে বয়স সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন।

রোহিদশ্বের স্ত্রী অবাক হয়ে তুই তরুণের দিকে তাকিয়েছিল। সৌন্দর্যের দিক থেকে ওরা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। তাছাড়া ওরা তুজন প্রাচী (সপ্তসিন্ধু)-র তুই বড় বড় রাজার পুত্র একথাও জানে রোহিদশ্বের স্ত্রী।

পখ্‌ত জাতিরা পুরুজাতিকে খুব সম্মান করত। তারা জানত যে ঐ পুরু জাতিই বিশাল পণি অসুর জাতির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে করে আর্যভূমিকে শত্রুমুক্ত করে রেখেছে।

—পখ্‌ত জনপদ এখান থেকে বহুদূরে থাকে। বললেন রোহিদশ্ব।

—তাতে কি হয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ্ ভালবাসা সে দূরত্বকে কাছে টেনে আনে। বলতে বলতে ত্রসদস্যুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ পুত্র, আমাদের শিরায় শিরায় একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

—আমার মনে হয় আমরা আপনাদের পশ্চিমে পড়ে গিয়েছি!

—না পুত্র! পূবদিকে পুরুদের পর আর্য জনপদ শেষ হয়ে গেছে। আর পশ্চিমে পখ্‌ত জনপদ পর্যন্ত যদিও সপ্তসিন্ধু শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আর্য জনপদ শেষ হয়নি।

—তবে কি তারও পশ্চিমে আর্য জাতি বাস করে?

—হ্যাঁ, আমাদের উত্তরে অনেক দূরে কুরুজাতি বাস করে। তাছাড়া সপ্তসিন্ধুতে এখন যে পৃথু পশু জাতি এসে বাস করছে ওদের একটা বিরাট অংশ আমাদের পশ্চিমে এবং উত্তর-পশ্চিমে বাস করে। পৃথু পশুদের দেশে আমি কয়েকবার গিয়েছি, কিন্তু কুরুদের ওখানে সবচেয়ে বেশি গিয়েছি। ত্রসদস্যুর আশ্চর্যের সীমা থাকে না। সে এতদিন ভাবত শুধু সপ্তসিন্ধুতেই বুঝি আর্যরা বাস করে।

—তাহলে পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত আর্য জনপদ রয়েছে? তারাও বুঝি আমাদের মত?

—দেশ-কালভেদে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই আছে।

—যেমন আমাদের মধ্যেও রয়েছে। আমাদের ভরত, কুশিক, তৃৎসুদের মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে যার জন্য হঠাৎ দেখলে আমরা অনায়াসে চিনে নিতে পারি, কেউ তাদের উষ্ণীষের কোণ বাঁদিকে হেলিয়ে বাঁধে, কেউ ডান দিকে, কেউ বা সোজা।

—ওদিকেও তাই। যত পশ্চিমে যাবে পোষাক পরিচ্ছদ ততই সাদাসিধে ধরনের। যদিও তাদের পোষাক বা উষ্ণীষের কাপড়

আমাদের মতই পশমী, তবে সেগুলি খুব মোটা। তবে তার অর্থ এ নয় যে তারা রুক্ষ এবং অভদ্র। ভরত এবং পুরুদের ভূমিতে দৈবাত কখনো হিমপাত হয়ে থাকে। কিন্তু উচ্চ পখ্‌ত ভূমিতে প্রতি বৎসর হিমপাত হয়ে থাকে। সময় সময় এক-দুই হাত পর্যন্ত মোটা হয়ে হিম জমে থাকে। তাই কুরুদের ভূমির আর এক নাম তুষারভূমি। চার পাঁচ মাস পর্যন্ত সেখানে গাছপালা ন্যাড়া হয়ে থাকে। যতদূর দুচোখ যায় মনে হয় যেন পৃথিবীটা সাদা দুধের আস্তরনে ঢাকা রয়েছে। অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য সেখানকার লোকেরা স্নান করতে ভয় পায়। এখানকার লোকের ধারণা যে সেখানকার পখত্‌রা বোধ হয় শরীরে জলের ছোঁয়া লাগতে দেয় না। তাদের শরীরে দুর্গন্ধ ভরা।

—না আর্য! এ আপনি কি বলছেন! আমরা কখনো তা ভাবি না। মধুর ভাষীকে মিথ্যা বলে ভাবা অন্যায়।

রোহিদশ্ব প্রাণভরা হাসি হেসে বললেন,—আমাদের পূবদেশের আর্যরা বড় মধুরভাষী হয়ে থাকে। রোহিদশ্ব বুঝতে পারেন তার কথায় তরুণযুগলের মনে কিছুটা দুঃখ হয়েছে। তাই রোহিদশ্ব ওদের সান্ত্বনা দেবার জন্য ত্রসদস্যুর কাঁধে হাত দিয়ে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে বলল,—না কুমার, আর্য সদা এবং সর্বত্র সত্যবাদী হয়ে থাকে। তাদের কাছে মিথ্যাবাদী কথার মত কটুবচন আর হতে পারে না। আমার কথার অর্থ হ'ল প্রাচীর আর্যরা সত্যবাদী এবং মধুরভাষী।

পখ্‌ত শীতের সময় স্নান না করলেও গ্রীষ্মকালে তারা খুব স্নান করে থাকে। তবে আমাদের দেশের আরো পশ্চিমে ও উত্তরে কুরুদের দেশ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

ত্রসদস্যু দেখছিল কথায় কথায় তাদের আসল কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে নম্রভাবে বলল,—

—আর্য, পখ্‌তদেশীয় ঘোড়ার খুব প্রশংসা শুনেছি। সত্যিই কি ঐ দেশের ঘোড়া খুব প্রশংসার মত ?

রোহিদশ্ব এগিয়ে এসে ত্রসদস্যুর হাত ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বলেন—মুখে প্রশংসা শোনার চেয়ে চল নিজের চোখে দেখে নাও। আমার কাছে কুরুদেশীয় সুন্দর ঘোড়া আছে।

ত্রসদস্যু আর দিবোদাসের কাছে এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে। ঘর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে কিছুদূরে কয়েকজন পখ্‌তকে ঘোড়ার মাংস রান্না করতে দেখে রোহিদশ্ব দুই ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন,—যদিও আমরা ঘোড়ার মাংস ভালবাসি কিন্তু খাওয়ার চেয়ে ব্যবসা আমাদের কাছে বড়। তবে এই ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল বলে ওকে খাবার ব্যবস্থা করেছি। আমি আশা করি কুমার, তোমরা আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করবে।

—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, আর্য।

অতঃপর রোহিদশ্ব আরও খানিকটা দূরে একটা খোলা জায়গায় অনেকগুলি ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নানা রঙের সুন্দর সব ঘোড়াগুলি মনের আনন্দে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে।

রোহিদশ্ব একটা লাল রঙের ঘোড়াকে ডাক দিতে ঘোড়াটি ছুটে এসে রোহিদশ্বের মাথা শুঁকতে থাকে।

—এই কি কুরু অশ্ব ? প্রশ্ন করে ত্রসদস্যু।

—না পুত্র ! এটি পখ্‌ত জাতির অশ্ব।

অতঃপর রোহিদশ্ব দুটি ঘোড়ার কানের কাছে ছোট্ট দুটি কালো ফোটা দেওয়া চিহ্ন দেখে বললেন,—এই দেখ কুরু অশ্ব। এগুলি সত্যিই সচরাচর এতদূর আসবার সুযোগ পায় না। দেখতে গেলে ঐ বড়টা একটু মোটা মনে হয় বটে কিন্তু আমাদের পখ্‌ত ঘোড়ার তুলনায় ওকে মোটেই মোটা বলা যায় না।

ত্রসদস্যু আর দিবোদাস অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ঘোড়া দুটির দিকে। রোহিদশ্ব বুঝতে পারে ঘোড়া দুটি ওদের খুব পছন্দ হয়েছে। তাই ঘোড়া দুটিকে কাছে টেনে এনে রোহিদশ্ব স্নেহভরে বললেন,—

—এ দুটি আজ থেকে তোমাদের। আমার বীর পুত্রের জন্য এর চেয়ে ভাল উপহার আর কি থাকতে পারে?

ত্রসদস্যু নম্রতাভাব দেখিয়ে বলে,—আর্য, আপনার স্নেহই আমাদের সবচেয়ে বড় উপহার।

—বেশ, তাহলে একে আমার স্নেহের প্রতীক বলে স্বীকার করে নাও। আমি বেশি কথা বলতে জানি না। হয়ত সেদিক থেকে আমি আমার পুত্র অর্থাৎ তোমার কাছে জিততে পারব না। এখন তোমাদের মধ্যে বেছে নাও কোনটা কার পছন্দ।

ত্রসদস্যুর মুখে কৃতজ্ঞতার ভাষা সরে না।

কিছুক্ষণ যাবত চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু ভেবে পায় না।

অথচ বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতেও পারে না। তাই দিবোকে উদ্দেশ্য করে বলল,—দিবো! তুমি আমার ছোট ভাই, আগে তুমি তোমার ঘোড়া পছন্দ কর।

দিবোদাস দুটি ঘোড়াকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল। এতক্ষণ যেন ওদের কথা ও কিছুই শুনতে পায়নি। হঠাৎ ত্রসদস্যুর কথায় চমক ভেঙ্গে নিজেকে যেন অপ্রস্তুত মনে হল।

—আমি ছোট ভাই, অতএব ঐ ছোট ঘোড়া আমার। আর তুমি বড় বলে বড়টি তোমার।

রোহিদশ্ব দিবোদাসের কথা শুনে আনন্দে দিবোকে কোলে তুলে নিয়ে ওর চুলের আঘ্রাণ নেন।

—বৎস, তোমার বুদ্ধি দেখে আমার আশ্চর্য ও আনন্দের সীমা নেই। এই বয়সে ঘোড়ার পরীক্ষা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

দিবোদাস যেন একটু লজ্জিত হল,—না না, দাদা যেটা পছন্দ করবে সেইটা দাদা নিক।

ত্রসদস্যু দিবোদাসের মাথায় হাত রেখে আদর করে বলল,

—না ভাই, তুমি ঠিকই বলেছ। এতে লজ্জার কিছু নেই। আমি এখন বড় হয়েছি, অতএব এইটাই আমার যোগ্য ঘোড়া।

রোহিদশ্ব ঘোড়ার ঘেরা থেকে ওদের নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। আজ দুই রাজকুমার একসঙ্গে তার অতিথি।

চলতে চলতে পশ্চিম দেশীয় আর্যদের কথা শুনে দিবোদাসের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কখনও প্রশ্ন করে বসে, —সে জায়গা এখান থেকে কতদূর? আবার কখনও বলে,—আমরা কি যেতে পারিনা?

রোহিদশ্ব কথার রেশ টেনে উত্তর দেন—

—আমি যতদূর শুনেছি পশ্চিম দিকের সব জায়গায় আমাদেরই জাতি বাস করে। তারাও আমাদের মত ভাষায় কথা বলে। স্থান, কাল বিশেষে কোথাও কোথাও একটু আধটু পার্থক্য আছে। তবে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না। সকলেই ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনীকুমার এর পূজা করে। সকলেই তারা অতিথি পরায়ণ। আর যাবার কথা যদি বলো ত দূরদেশ যখন তখন কষ্ট ত নিশ্চয় হবে।

কোথাও বা রাস্তার অসুবিধা, কোথাও আবার গভীর জঙ্গলে বন্য হিংস্র পশুর ভয়।

দিবোদাস বেপরোয়া হয়ে উত্তর দেয়—

—রাস্তার অসুবিধা ত হবেই। তাছাড়া আমার মনে হয় যেখানে কষ্ট নেই সেখানে মজাও নেই। আমি আর একটু বড় হলে সেই সব দুর্গম পথে নিশ্চয় যাত্রা করব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে, দাদা! ত্রসদস্যু হেসে বলল,

—আচ্ছা তাই হবে। আমরা দুভাই একসঙ্গে থাকলে সমগ্র আর্যভূমিতে আমাদের রুখবে কে? পাথর-মাটি এক করে ফেলব।

সকলে ঘরে এসে পৌঁছতে রোহিদশ্বের স্ত্রী আর কন্যা সকলের সামনে কাঠ ও তামার ভোজনপাত্র সাজিয়ে দিয়ে যায়।

খাবার সামগ্রীর মধ্যে কিছু ঘি-এ ভাজা আর কিছু আগুনে ঝলসানো মাংস। ঘি-এ ভাজা রুটি আর চামড়ার পাত্রে সোমরস।

আতিথেয়তায় ত্রুটি নেই।

রোহিদশ্ব পুত্রী ওজা মাঝে মাঝে এসে ওদের পাত্রে সোম ভরে দিয়ে যেতে থাকে। চৌদ্দ বৎসর বয়সের এই তরুণীর দেহে যৌবন এখনো সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি কিন্তু তার সুন্দর মুখের দিকে ত্রসদস্যু বার বার তাকিয়ে দেখে। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ রয়েছে ওর চাহনিতে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে ওরা এতখানি আপন হয়ে গেছে ভাবতেও আনন্দ লাগে। যেন কত যুগ যুগান্তরের পরিচয় ছিল ওদের মধ্যে।

ভোজন শেষ হলে ত্রসদস্যু আর দিবোদাস সকলকে অভিবাদন করে বিদায় নেয়। রোহিদশ্ব আর আর স্ত্রী আশীর্বাদ করে বলে,—পুনর্দর্শনায়, বৎস!

দুজন দাস রোহিদশ্বের দেওয়া ঘোড়া দুটিকে নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসে।

প্রায় একমাস হ'ল অশ্ব-সমন বা অশ্বমেলা শুরু হয়েছে। এবার শেষ হতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী।

যে জন্য এই মেলার নাম হয়েছে অশ্বমেলা তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আসল পরিদর্শন হবে আজ।

প্রায় আধযোজন খোলা মাঠের একদিকে শত-সহস্র নর-নারী ভীড় করে অপেক্ষা করছে। এদের মধ্যে পণিদের সংখ্যাই বেশি।

বাছাই করা ঘোড়ার দৌড় হবে আজ।

গত বারোদিন যাবত হাজার হাজার ঘোড়ার দৌড় হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র কুড়িটা ঘোড়া শেষদিনের দৌড়ে যোগ দেবার মত উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। আজ তাদেরই দৌড় হবে এবং বিচারক মণ্ডলীর শেষ নির্ণয় ঘোষণা হবে।

পর পর কুড়িটা ঘোড়া সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পাশে বধ্রযশ্ব, পৈজবন, পুরুকুৎস, পৌরব প্রভৃতি আর্য রাজা ও রাণী দাড়িয়ে আছে। ভীড় ক্রমশঃ বাড়ছে। প্রত্যেক মানুষটি একেবারে কাছ থেকে দেখবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ভীড়ের চাপ এত বাড়ল যে মনে হয় এই বুঝি সব হুড়মুড় করে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়বে।

কিন্তু আর্যজাতি শিষ্টাচার ভঙ্গ করতে জানে না।

ভীড় যেমন তেমনিই রইল। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে সেই ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছে। কখন ঘোড়া ছুটবে।

সাধারণ জনতা শুনেছে মেলার শেষে যে সকল ঘোড়া দৌড়বে তারা উড়বে। মাটির উপর দিয়ে তারা চলে না। বাতাসে ভর করে উড়ে বেড়ায়।

একটু একটু করে প্রতীক্ষার সময় শেষ হয়ে যায়।

বধ্রযশ্বের সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত শত কাড়া-নাকাড়া ভীষণ শব্দে বেজে উঠে। আকাশ বাতাস গুরু গুরু শব্দে কাঁপতে থাকে। সেই সঙ্গে কুড়িটা ঘোড়া লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করে। হাজার হাজার জোড়া চোখ সেই ছুটন্ত ঘোড়ার পিছনে ছুটতে থাকে।

সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

কুড়িটা ঘোড়া ছুটে চলেছে। সত্যিই যেন বাতাসে ভর করে ছুটছে। প্রায় ষাট হাত এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ বাঁদিক থেকে মানুষের ভীড় থেকে আর একটা ঘোড়া তীরের বেগে ছুটে এসে ওদের দলের সঙ্গে ছুটতে লাগল।

প্রথম কয়েক মূহূর্ত প্রথম সারিতে পাঁচটা ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে লাগল, দর্শকরা অবাক হয়ে অশ্বারোহীর দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু কেউ চিনতে পারে না ঘোড়ার পিঠে কে বসে আছে। প্রতি মুহূর্তে ঘোড়াটি তার পাশের ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে এক-দুই হাত আগে চলে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় নতুন ঘোড়সওয়ার। তার পর আরও আগে। অনেক আগে। সবচেয়ে প্রথম যে ঘোড়া আসছিল তার চেয়েও একশ হাত আগে, হাওয়ায় ভেসে চলেছে যেন।

অনেকে দেখতে পেয়েছিল ঐ অশ্বারোহী একজন বালক। কিন্তু কে ঐ বালক? সকলের মনে একই প্রশ্ন।

কথাটা মুখে মুখে পলকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সকলের মনে একই চিন্তা।

এ কাজটা যদিও এই প্রতিযোগিতার নিয়ম বিরুদ্ধ। সকল ঘোড়া একই জায়গা থেকে একই সঙ্গে দৌড় শুরু করবে। তা ছাড়া এই শেষবার দৌড়ের আগে তাকে অন্ততঃ আট-দশবার দৌড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

যে কোনো কাজে নিয়মভঙ্গকারীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হবে। তবে সে যদি জিততে পারে তাহলে তাকে ক্ষমা করাও যেতে পারে।

এই দৌড়ের নিয়মভঙ্গকারী অশ্বারোহী সেই যে সকলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে সেই থেকে তার একশ হাতের মধ্যেও কেউ আসতে

পারেনি। দৌড়ের সীমানা যতই কমে আসতে থাকে ঘোড়ার বেগ যেন ততই বাড়তে থাকে। এখন অশ্বারোহীকে আর আলাদা বলে দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়ার পিঠের উপর এমনভাবে শুয়ে রয়েছে যে খুব কাছ থেকেও যারা এক পলকের জন্য দেখেছে তারাও ঐ বস্তুটিকে ঘোড়ার অভিন্ন অংশ বলে ভুল করেছিল।

·হাজার হাজার দর্শক অধীর আগ্রহে এই অদ্ভুত ঘোড়সওয়ারকে দেখবার জন্য সীমারেখার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘোড়া সীমারেখা পার হয়ে কিছুদূরে গিয়ে তার গতিবেগ একটু কমিয়ে আবার ফিরে আসে।

পুরুকুৎস স্বয়ং এই অশ্বারোহীকে স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে আসে। ঘোড়া দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠের মানুষটি মুখ তুলে তাকায়। পুরুকুৎস চমকে ওঠে আরোহীর দিকে তাকিয়ে। তার অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, দিবা? সঙ্গে সঙ্গে এক হ্যাঁচকা টান মেরে দিবাকে কোলে তুলে নেয়।

বধ্রযশ্ব দিবার নাম শুনে এগিয়ে আসে সেখানে।

দিবোদাসের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একদৃষ্টে ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ দাঁড়ান অবস্থা থেকেই ঘোড়াটি ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায় আর তার নাক ও মুখ দিয়ে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসে। দিবোদাস পুরুকুৎসের কোল থেকে এক লাফে নিচে নেমে ঘোড়ার কাছে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে,

—হায় দধ্রিকা, তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা, যেওনা।

উপস্থিত দর্শক হুড়মুড় করে এগিয়ে আসে। কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে গোল হয়ে দাঁড়ায়। কারো মুখে রা শব্দটি নেই। সবাই শুধু ভাবছে এ অসম্ভব কি করে সম্ভব হ'ল।

দিবোদাসের চোখের জলে ঘোড়ার পিঠ ভিজে যায়। অত্যন্ত

চঞ্চল হয়ে ও একবার ঘোড়ার মুখ ধরে আদর করে, একবার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়,—হায় দধ্রিকা, তুমি ওঠো, ওঠো, আমাকে ছেড়ে যেও না। মাত্র বারো দিনের পরিচয়ে তুমি নিশ্চয় আমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু হতে পেরেছিলে। হায়! আগে যদি জানতাম যে বিজয়ের পরিণাম এই হবে, তাহলে কখনোই তোমাকে নিয়ে মাঠে আসতাম না। কখনোই গুরুজনের আজ্ঞাভঙ্গ করে অপরাধী হয়ে তোমাকে হত্যার মহাপাপ করতাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে দধ্রিকার শরীর স্থির হয়ে যায়। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে যায়। সত্যিকার বিশ্বস্ত বন্ধুর মত তার স্নেহপূর্ণ প্রভুর মাথায় জয়ের মুকুট পরিয়ে দিয়ে সে নিজের জীবন দান করল। এ দৃশ্য যারা স্বচক্ষে দেখেছিল তারা জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না।

রোহিদশ্ব কিছুদূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। দিবোদাসের কান্না দেখে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। এগিয়ে এসে দিবোদাসের হাত ধরে তুলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলেন,—পুত্র! এখন দুঃখ করে লাভ নেই। দধ্রিকা তার কর্তব্য পালন করে চলে গেছে। যুদ্ধ করতে করতে বীর যেমন বীরগতি প্রাপ্ত হয় তাদের মতই সত্যিকার বিশ্বস্ত ঘোড়া দধ্রিকা বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছে। কুরু ভূমিতে জন্ম নিয়ে ও নিজের জাতির নাম উজ্জ্বল করেছে। ওর জন্য চোখের জল ফেলা উচিত নয় বৎস। তুমি বীরসন্তান, নিজেও বীর। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন নিষ্প্রাণ বীরকে দেখে কেউ অশ্রুপাত করে না, তেমনি তুমিও দধ্রিকার কথা ভুলে যাও।

দিবোদাস চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায়।

রোহিদশ্বের সান্ত্বনার কথা ওর মনে দাগ কাটে। ও জানে ঐ ঘোড়াটি রোহিদশ্বই ওকে স্নেহের দান বলে উপহার দিয়েছিলেন।

দভ্রিকা রোহিদশ্বের কাছেও কম প্রিয় ছিল না। তা তার মুখের ভাব দেখলেই বোঝা যায়। দিবোদাস লক্ষ্য করছিল দভ্রিকার মৃত্যুতে রোহিদশ্ব যথেষ্ট চেষ্টা করেও চোখের জলকে রোধ করতে পারেনি।

আর্য তার নিজের আত্মীয়ের চেয়েও তার প্রিয় ঘোড়াকে বেশি ভালবাসে।

রোহিদশ্বের চোখ জল ছলছল দেখে দিবোদাস বাধ্য হয় নিজেকে সংবরণ করতে।

শেষবারের মত করুণা ভরা দৃষ্টিতে দিবোদাস দভ্রিকার দিকে তাকায়। তারপর সকলে একরকম জোর করেই দিবোদাসকে ওখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যায়।

বিজলীর মত খবরটা সমস্ত ভীড়ের মধ্যে রটে যায়—এ বৎসর অশ্বসমনের বিজেতা অশ্ব পুরুদেশীয়, আর তার আরোহী ছিল দিবোদাস।

বধ্রযশ্বের সন্তান-জন তৃৎসুদের ভাবী রাজা দিবোদাস। আর্য-জাতির মধ্যে বারো-বৎসর বালকের ঘোড়ায় চড়া এমন কিছু অসম্ভব নয়। দিবোদাসের বয়স এখনো বারো পার হয়নি। কিন্তু সমগ্র সপ্তসিন্ধুর বাছাই করা শ্রেষ্ঠ ঘোড়ার প্রতিযোগিতায় এমনি সাফল্য অসম্ভব বলা যায় অনায়াসে।

ধীরে ধীরে সকল খবর জানাজানি হয়।

মাত্র বারো দিন আগে দিবোদাস ঐ কুরু জাতীয় ঘোড়াটি উপহার পেয়েছিল পখত্ সরদার রোহিদশ্বের কাছে থেকে। সেই প্রথম দিন থেকে দুজনের মধ্যে এতখানি মিল হয়ে গেছে যে দেখলে মনে হত যেন কতযুগের পরিচিত ওরা।

দিবোদাস তার ভালবাসার প্রমাণ দেয় প্রথমদিনই ঘোড়াটির নাম রাখে—দভ্রিকা।

দভ্রিকা—অর্থাৎ ধরলেই যে ছুটতে আরম্ভ করে।

সেই থেকে দিবোদাসের একমাত্র ধ্যান-ধারণা যেন দভ্রিকা।

কখনো নিজে হাতে কচি কচি ঘাস এনে খেতে দিচ্ছে, কখনো বা অন্যঘাস আনিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ওর পিঠে চেপে খানিকটা দৌড় করিয়ে আনে।

পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই দিবোদাস দভ্রিকার স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়।

সেদিন ওর মনে পড়ল দভ্রিকা অনায়াসে অশ্ব-সমন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু দিবোদাস এও জানে যে বারো বৎসরের বালককে প্রতিযোগিতায় নামা ত দূরের কথা, এমন কি পরীক্ষা দিতেও স্বীকৃত হবে না কেউ।

পিতার দিক থেকে হয়ত কোনো বাধা আসবে না। কিন্তু মা তার কোমল সন্তানকে কখনোই এতবড় ঝুঁকি নিতে দেবে না।

শুধু শোনা কথা নয়, নিজের চোখেও দু-একবার দেখেছে এই অশ্ব-প্রতিযোগিতায় কয়েকজন অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। কখনো বা একসঙ্গে পড়ে গিয়ে দুজনেরই প্রাণান্ত হয়েছে।

নিজের শিশুবুদ্ধিতে দিবোদাস বুঝতে পারে কোনপ্রকারেই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

এমনি আরো দু-দিন কাটল।

এবার দিবোদাসের পুরো বিশ্বাস জন্মায় যে দভ্রিকা অনায়াসে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার উপযুক্ত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, উত্তর কুরুদের নামের উপরেও ওর একটা অখণ্ড বিশ্বাস জন্মেছিল।

দিবোদাস মনে মনে ঠিক করল ও যোগ দেবেই। সে কথা

এমন কি বিশ্বস্ত বন্ধু বা স্নেহময় দাদাকেও জানাল না। সুযোগ পেলেই একবার দভ্রিকার সঙ্গে কথা বলে নিত। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দভ্রিকা একথা কাউকে বলবে না।

এমনি একটি একটি করে দিন যায়, ক্ষণ যায় আর দিবোদাসের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বার বার দভ্রিকার কাছে গিয়ে বলে, দভ্রিকা! এই প্রতিযোগিতায় তোমাকে জিততেই হবে। নইলে আমার মান থাকবে না।

তারপর প্রতিযোগিতার দিন ওর মা-বাবা ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে দিবোদাস নানা অজুহাতে পরে যাবে বলে বাড়ীতে রয়ে গেল।

বধ্রযশ্ব বুঝতে পারেনা দিবার পরে যাওয়ার কারণ কি।

মা পৌরবী আদর করে তাড়াতাড়ি আসবার কথা বলে স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

সকলের শেষে দিবা দভ্রিকাকে নিয়ে মাঠের দিকে রওয়ানা হয়। সেখানে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ভীড়ের পিছন দিকে অপেক্ষা করতে থাকে। ওর কর্মসূচী আগে থেকেই স্থির ছিল। যেই অন্য ঘোড়ার দল ছুটতে শুরু করল অমনি খানিকটা দূর থেকে দিবোদাস ঝড়ের মত এগিয়ে এলো। ওর ঘোড়ার গতিবেগ দেখে পলকের মধ্যে জনতা কোনোপ্রকারে একটু সরে গিয়ে রাস্তা করে দিল এবং ঠিক সামনে গিয়ে অন্য দলের সঙ্গে সমানে মাঠের মধ্যে ছুটতে লাগল।

জীবনের প্রথম এতবড় সাফল্যের জন্য দিবোদাসের যে অপার আনন্দ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দভ্রিকাকে হারানোর বেদনা জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ভুলতে পারেনি।

দভ্রিকার স্মৃতিকে আমরণ বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিবোদাস জীবনে যতগুলি ঘোড়া ব্যবহার করেছে তার সবগুলির নাম রাখত দভ্রিকা।

সপ্তসিন্ধুর এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত বভ্রযশ্বের বীরত্বের এবং অন্যান্য গুণের জন্য সকলে মুগ্ধ ছিল। কিন্তু এত অল্প বয়সে এক মুহূর্তে পুত্র পিতাকে ছাড়িয়ে যাবে একথা কেউ কল্পনাও করেনি।

বভ্রযশ্বের নাম যদি প্রথম থেকে প্রসিদ্ধিলাভ না করত তাহলে হয়ত লোক বভ্রযশ্বকে দিবোদাস পিতা বলে পরিচয় দিত।

মাঠ থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মা পৌরবী ছুটে এসে পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। আনন্দের আতিশয্যে পৌরবীর চোখে জলের ধারা নেমে আসে। বার বার স্নেহচুম্বনে ভরে দেয় বীর পুত্রের প্রতি অঙ্গ।

দিবোদাস বুঝতে পারে মা তার দেহের কোথাও আঘাতের সন্ধান করছে। মুচকী হেসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল,

—মা, আমার দেহে কোথাও আঘাত লাগেনি। দভ্রিকার জীবন থাকতে আমার শরীরে আঘাত দিতে পারত না। জয়লাভ করে যতক্ষণ আমি ওর পিঠ থেকে মাটিতে পা না রেখেছি ততক্ষণ দভ্রিকা তার মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। এ দুঃখ আমি কখনোই ভুলতে পারবো না মা। আমাকে বিজয় মুকুট পরাতে ও নিজের জীবন দান করল। মাত্র কয়েকটা দিনের পরিচয়ে ও যে আমার এতখানি আপন হবে তা ভাবিনি। তবে আমি জানতাম সে আমাকে কতখানি ভালবাসত।

সান্ত্বনা শুধু এই যে, সে আমাকে বিজিত দেখে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পেরেছে।

আর আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না।

মা আবার বুকের মধ্যে চেপে ধরে দিবোদাসকে।

## ॥ চার ॥

**"স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া"**

[ খৃঃ পূঃ ১২০৪ ]    ( ঋক—৯।১।১ )

সাত সিন্ধুর মধ্যে একমাত্র সরস্বতী ছাড়া অন্য সকলের চেয়ে বিপাশ ( ব্যাস ) নদী ছিল ছোট।

তবুও সে তার অন্য পাঁচ বোনের মত হিমালয়ের হিমানীর মধ্য থেকেই বেরিয়ে বয়ে আসছে।

অন্য সকলের মত বিপাশও সদানীরা।

সে ছোট হলেও তার মহিমা ছোট নয়। নিজগুণে প্রসিদ্ধ বিপাশ। তাই বিপাশের নাম সকলের মুখে মুখে।

বিপাশের আর এক নাম আর্জিকিয়া।

আর্জিকয়ার দুই তীরে প্রসিদ্ধ সোম ( ভাং )-এর নেশা লেগে থাকে সপ্তসিন্ধুর নানা জাতির লোকের চোখের পাতায়।

পস্ত্য, শর্মণাবত-এ উৎপন্ন সোম-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে আর্জিকিয়া বা বিপাশ নদীর তীরের সোম।

সপ্তসিন্ধুর প্রতি ভাগ ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। এই সকল জঙ্গলে সিংহ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর অভাব নেই। তাদের প্রভাবও কম নয়।

কিন্তু মানুষ কখনো অন্য কোনো প্রাণীর অধিকার স্বীকার করেনি।

মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের অধিকারই শ্রেষ্ঠ অধিকার।

ভারতের সকল প্রান্তের মধ্যে সপ্তসিন্ধুর জমিতে প্রকৃতির দান ছিল সবচেয়ে বেশি।

দস্যু অর্থাৎ পণি এবং কিলাত জাতিরা সংখ্যায় আর্যজাতির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু আর্যরা সপ্তসিন্ধুর ভূমিতে অন্য কোনো জাতির অধিকার স্বীকার করে না। আর্যজাতিই সপ্তসিন্ধুর প্রকৃত স্বামী। আর সকলে উপেক্ষিত।

বৃদ্ধ ঋষিরা সপ্তসিন্ধুর স্থানে স্থানে তাঁদের আশ্রম বা কুল প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। এই সব আশ্রমে একমাত্র তাঁদের স্বগোত্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল না। এখানেই আর্যদের বীর আর বিদ্বান তৈরী করা হ'ত।

আর্যঋষিরা একমাত্র কর্তব্য বলে পালন করতেন—আদিম বয়সে ব্রহ্মচর্য, বাকী সারাজীবন তপ-স্তুতি আর দান-ধ্যান করা।

তবে ব্রহ্মচর্যের নামে শুধু ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করবার কোনো নিয়ম নেই। ব্রহ্মবেদ এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য পরিশ্রম করাই ব্রহ্মচর্য।

বিপাশ যেখানে শতদ্রুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার কয়েক ক্রোশ দূরে উপরের ডানদিকের তটে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম ছিল। এখানকার আকাশ নিরভ্র স্বচ্ছ হলেও এখান থেকে হিমালয়ের শ্বেত-শুভ্র শিখর খুব কাছে মনে হত।

আশ্রম বা গোত্র স্বাবলম্বী ছিল।

আশ্রমের লোকেরাও সুযোগ মত হাজার হাজার ঘোড়া-গরু লুঠপাট করে এনে নিজেদের ঐশ্চর্য বৃদ্ধি করত।

ভরদ্বাজ গোত্রের সম্মান আর্যজনের মধ্যে পরিগণিত হত। আর্যরাও ওদের নিজের অঙ্গ বলে মনে করত।

সপ্তসিন্ধুর অপর ভাগের পার্থব সম্রাট তনুপুত্র অভ্যাবর্তী চায়মান তার শিক্ষাশেষে খুশী হয়ে গুরুকুলে বহু দাস-দাসী, রথ ও গরু দান

করে। এমনি বহু ধনী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি বৎসর বিরাট ধন-ঐশ্বর্য লাভ করে থাকে গুরুকুল ভরদ্বাজ আশ্রম।

বিপাশের পূবদিকের আর্য রাজা সৃঞ্জয় পুত্র মহীরাধ বিরাট যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত মহাঋষি ভরদ্বাজ। এই যজ্ঞে বহুদেশের রাজা-মহারাজা ও সম্মানীয় পুরুষ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

এমনি ভাবে ভারতবর্ষের উদয়াস্ত পর্যন্ত ভরদ্বাজ আশ্রমের যশগান গাওয়া হত।

যদিও আর্যজনের মধ্যে ভরদ্বাজ মুনির আগে কয়েকজন ঋষি হয়েছিলেন কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তাঁদের কথা বর্তমান আর্যজন একপ্রকার ভুলে গেছে। তাছাড়া আর্যরা তাঁকেই মহাঋষি বলে ভক্তি শ্রদ্ধা করত যিনি সাক্ষাত ঈশ্বরদর্শী। তার পূর্বেকার ঋষিদের মধ্যে এমন কমই ছিলেন বলে তাদের নাম আজ আর আর্যজন-এর মধ্যে তেমন শোনা যায় না।

এই দৃষ্টিতে ভরদ্বাজ ঋষিকে আদিম ঋষি বলা যায়।

পঙ্কজে পদ্মফুলের মত ছিল বধ্রযশ্বের ইতিকথা।

পুরুজাতির শাখা ভরত জাতির তুচ্ছ এক জন তৃৎসু পরিবারে জন্ম হয়েছিল মহাবীর বধ্রযশ্বের। আজ সমগ্র আর্যজন-এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী পুরুষ বধ্রযশ্ব।

যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্রের কথা খুব কমই শোনা যায়। কখনো সংযোগ বশতঃ দু-একটা হয়ে থাকবে হয়ত।

দিবোদাস মাত্র বারো বৎসর বয়সে অশ্ব-সমন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে যখন সমগ্র সপ্তসিন্ধুর শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীর সম্মান লাভ করল, তখন যোগ্য পিতা বধ্রযশ্ব পুত্রের উন্নতির দিকে আরো বেশি মন দিলেন।

বভ্রযশ্বের মনের মধ্যে অনেক আশার প্রদীপের মালা গাথা হতে থাকে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে পিতার বুক গর্বে ফুলে ওঠে।

কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা দিতে উপযুক্ত গুরু চাই। বভ্রযশ্ব চিন্তা করতে থাকে এমন যোগ্যতম গুরু কে থাকতে পারে।

ভেবে-চিন্তে বভ্রযশ্ব সাব্যস্ত করল অঙ্গিরা-গোত্রী বৃহস্পতিপুত্র মহাঋষি ভরদ্বাজই একমাত্র যোগ্য গুরু এবং ভরদ্বাজ কুল যোগ্যকুল।

দুঃখের বিষয় আরো পাঁচ সাত বৎসর আগে যদি দিবোদাসকে গুরুকুলে দেওয়া হত তাহলে আজ ওর অনেক উন্নতি হত।

আর দেরি করা উচিত নয়। অশ্ব-শমন শেষ হয়েছে। বর্ষা আসে। এ সময় কোথাও যাওয়া ঠিক নয় ভেবে বাধ্য হয়ে দুমাস অপেক্ষা করতে হল।

বর্ষাকাল শেষ হতে বভ্রযশ্ব দিবোদাসকে সঙ্গে নিয়ে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বহু ঘোড়া, গরু, ষাঁড়, খচ্চর নিয়ে বভ্রযশ্বের যাত্রা শুরু হয়। এত পশুর মধ্যে কিছু পাথেয় আর বাকী ভরদ্বাজকে দান করবার জন্য।

পথের মধ্যে দু-তিন জায়গায় বিশ্রাম করে দুই সপ্তাহ পরে ভরদ্বাজ আশ্রমের গোচর ভূমির মধ্যে প্রবেশ করে ওরা। দূত অনেক আগেই সংবাদ নিয়ে আশ্রমে পৌঁছেছে। অতএব চিন্তার কোন কারণ নেই।

বর্ষার ভয় কমে গেছে। ভরদ্বাজ কুলের ঘর বিপাশের চর পর্যন্ত সরে এসেছে। এরই আশপাশের জমিতে যব-এর চাষ হয়েছে প্রচুর। এখনো যবগাছ পাঁচ আঙ্গুলের বেশি বড় হয়নি।

ঋষি তাঁর অন্যান্য শিষ্য এবং অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে চাষের কাজ দেখাশোনা করছেন। বিপাশ-এর একটা খাল চাষের জমির ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে। এরই কৃপায় এখানকার চাষের উন্নতি হয়েছে প্রচুর।

ভরদ্বাজ কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে এই খালের একজায়গায় বসে কথা বলছিলেন। এমন সময় বভ্রযশ্ব ছয় সাত জন লোক সহ সেখান এসে পৌঁছায়।

উভয়ের মধ্যে প্রথম থেকেই পরিচয় ছিল। বয়সে দুজনের মধ্যে আট-দশ বৎসরের পার্থক্য। কিন্তু নিজ গুণমহিমার জন্য ভরদ্বাজকে বভ্রযশ্ব থেকে অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে হত।

বভ্রযশ্ব এবং তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে ঋষিকে নমস্কার করে। ঋষি সম্মানীয় অতিথিকে উপযুক্ত আসন এবং সু-সম্ভাষণে স্বাগত জানান।

সকলে আসন গ্রহণ করতে ঋষি হাসিমুখে বভ্রযশ্বকে বলেন—আর্যের একটু অসুবিধা হবে এখানে। আজই আমরা আমাদের আশ্রমে ফিরে যাব।

—না না, আমাদের অভিধানে কষ্ট বলে কিছু নেই। যে জীবনে কষ্ট নেই সে জীবনে সুখের অনুভব আছে বলে আমার মনে হয় না। বলল বভ্রযশ্ব। আমার পুত্র শ্রীমান দিবোদাস আপনার আশ্রমে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে বলে এসেছে। কৃপা করে ওকে স্বীকার করলেই আমারা কৃতার্থ হবো।

—এ তো অত্যন্ত সুখের কথা। দিবোদাস ইন্দ্রের পরম কৃপাপাত্র। ইন্দ্র ওকে দিয়ে তাঁর খুব বড় কাজ করিয়ে নিতে চান। আমি সানন্দে স্বীকার করছি কুমার দিবোদাসকে। গত অশ্ব-শমন প্রতিযোগিতায় ওর জয়লাভের কথা আমি শুনেছি। যোগ্য শিষ্যের দ্বারাই ত গুরুর গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর পথে কোনো অসুবিধা হয়নি ত ?

—না, একেবারেই নয়।

বভ্রযশ্বের ইশারা পেয়ে দিবোদাস ঋষিকে গিয়ে প্রণাম করে। ঋষি আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আশির্বাদ করেন।

দুপুর তখন গড়িয়ে পড়েছে।

এবার আশ্রমে ফিরতে হবে। আজ অবশ্য অন্যদিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। যদিও অতিথিদের থাকা ও খাওয়ার সব ব্যবস্থাই তৈরী হয়ে আছে।

এখান থেকে ভরদ্বাজ আশ্রমের গ্রামটি বেশ দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে গ্রামের দিকে রওয়ানা হয়। গ্রামের সব ঘরগুলিই খড়ের ছাউনি। কাঠের খুঁটি এবং কাঠ দিয়েই ঘেরা। ঘরগুলি যদিও স্থায়ী নয় তবুও এমন মজবুত করে তৈরী যে বর্ষার আঘাত অনায়াসে সহ্য করতে পারে।

তাছাড়া এগুলির নির্মাণ সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঘরের মধ্যে শত শত বৃষভ চর্ম বিছানো রয়েছে। এখনও তার মধ্যে কিছু কিছু তাজা রয়েছে।

অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ভরদ্বাজ বভ্রযশ্বকে উঁচু আসনে বসতে দিলেন। কিন্তু ভরত-কুলাধিপতি রাজা বভ্রযশ্ব তা স্বীকার করতে রাজী নয়।

বয়স এবং বিদ্যায় ঋষি বভ্রযশ্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বভ্রযশ্বের বয়স পঞ্চাশ আর ঋষির পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন।

রাজার শরীর ভারী, গম্ভীর।

ঋষির শরীরে এখনো যৌবনের চঞ্চলতা আর গুণের গম্ভীরতা। আচারে ব্যবহারে এতটুকু বার্দ্ধক্যের ছাপ নেই। কিন্তু গাছ যেমন ফলভারে নত হয়ে পড়ে ভরদ্বাজ ঋষি তেমনি নিজগুণভারে নত।

ঋষির মুখের সোনালী দাড়ীর মধ্যে কিছু কিছু সাদা দাড়ী যদি সহায়তা না করত তা হলে লোকে ঋষিকে বভ্রযশ্বের চেয়ে ছোট মনে করত।

প্রথমে কুশল-মঙ্গল প্রশ্নের অবতারণা হয়। অতঃপর অতিথিদের জন্য মধুপর্ক। বড় বড় মাটির ঘড়ায় ক্ষীর আর মধু মিশ্রিত সোমরস

আসে। তার সঙ্গে কচি বাছুরের ভাজা মাংস আর কাঠের চষকে সোমরস ঢেলে অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হয়।

ঋষি ভরদ্বাজ নিজের হাতে বভ্রযশ্ব আর দিবোদাসের সামনে খাবার পরিবেশন করেন। তারপর সকলে মিলে ইন্দ্র আর সোম-এর স্তুতি করে। স্তুতি শেষ হলে ঋষি ভরদ্বাজ বললেন,—অশ্মা ভবতু নস্তনঃ ( ঋক ৬।৭৫।১২ )।—হে সোম! তোমার সুস্বাদু মহান ধারায় আমাদের পবিত্র করো। আমাদের শরীর পাথরের মত করে গঠিত হোক।

ঋষির সঙ্গে সকল সমাজ মুখরিত হয়ে ওঠে।

আর্যজাতির সবচেয়ে পবিত্র আনন্দ হ'ল সোমপান। নেশায় যখন সকলের চোখ আরক্ত হয়ে আসে, সবকিছুর বন্ধন তখন ঢিলে হতে থাকে। আর্য নরনারী চষকের পর চষক পান করে চলেছে। ঋষিও রয়েছেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু ঋষির মুখের বাণী সকলের চেয়ে গম্ভীর এবং অসাধারণ।

এখানে এখন কেউ কারো পর নয়। যেন একই পরিবারের সকলে মিলে মধুপর্ক উৎসব পালন করছে। আনন্দের উচ্ছল তরঙ্গে সকলে নির্বিকারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এতটুকু বাধা নেই, বন্ধন নেই কারো।

শুধু গান আর নাচ। নাচ আর গান। আর চষকের পর চষক সোম। সেই সন্ধ্যায় শুরু হয়েছিল আর শেষ হতে অর্ধেকেরও বেশী রাত হয়ে যায়।

সকলের চোখে মুখে যেন সোমদেব ভর করেছেন।

ইচ্ছা করলেই ইচ্ছামত জায়গায় যাওয়ার ক্ষমতা তখন প্রায় সকলেরই রহিত হয়েছে।

ঋষি ভরদ্বাজের কাছে এসে দিবোদাস আর্যজাতির বংশানুক্রমিক

অর্জিত বিদ্যা শিখতে লাগল। মেধাশক্তি অসাধারণ ছিল বলে অতি অল্পদিনেই এক একটি সোপান পার হয়ে যেতে থাকল দিবোদাস।

ওর জীবনের সবকিছুতেই ঘোড়ার গতিবেগ যেন।

সেদিনকার ঘোড়দৌড়ে জেতা সেই ছোট কিশোর যেন শুধু সকলের আগে লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যেই জন্ম নিয়েছিল।

যে কোনো বিষয়ে সহপাঠীদের চেয়ে এক ধাপ আগে পৌঁছানোই যেন ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং গুণ।

দিবোদাসের কয়েক বৎসর আগে যে সব শিক্ষার্থীরা আশ্রমে এসেছিল মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে গেল। এই বন্ধুত্বে ওদের জীবনে কখনো এতটুকু ভাটা পড়েনি।

ওর সঙ্গীদের মধ্যে ভুজরু, তোগ্য, কুৎস, আরুনেয় প্রভৃতির সঙ্গে ওর হৃদ্যতা বেশি।

প্রতিদিন সকালে আশ্রমে প্রাতঃকালীন অগ্নিপরিচরনের পর ঋষি নিজের এবং পূর্বঋষিগণের শ্লোকগাথা উচ্চারণ করতেন, আর সকল শিক্ষার্থীরা তাই সুর করে আবৃত্তি করত। নিজের বাণীর সংখ্যা যেমন কম ছিলনা তেমনি পূর্বঋষিদের বাণীও ছিল যথেষ্ট। যদিও পূর্বঋষিদের সকল বাণী সকলের কাছে সংগ্রহ ছিল না। কিছু কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে।

এমনি এক অজ্ঞাত ঋষির সৃষ্টি পুরুরবা-উর্বশী সংবাদ শ্লোকগাথা। প্রতিদিন ঋষির সঙ্গে আবৃত্তি করতে করতে সকল শিক্ষার্থীদের মুখস্ত হয়ে যেত। দিবোদাস কিন্তু একবার আবৃত্তি করেই মুখস্ত করে ফেলত।

অশ্বারোহণের কোনো কারসাজীই দিবোদাসের শিখতে বাকী ছিলনা। ধনুর্বান চালাতেও দিবোদাস ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যভেদি। তবুও এর অনেক কিছু বিদ্যা ওর শুধু দেখে শেখা ছিল। একটি মাত্র মানুষের পক্ষে সব রকম বিদ্যায় পারদর্শী হলেও বহুসংখ্যক

শত্রুকে জয় করা অসম্ভব। সে জন্য তাকে পাকা সেনানী হওয়া দরকার। এখানে গুরুমুখে নিয়ম কানুন শিখতে হয় সকলকে। তবে সে সফল সেনানী হতে পারবে।

দিবোদাসের মেধাশক্তি দেখে গুরুদেব ভীষণ খুশী হয়েছিলেন। ওর তৎপরতা দেখে সকলে মুগ্ধ হত, তখন দিবোদাস বলত,—গতিহীন জীবন আবার জীবন না কি? ওর দিকে তাকিয়ে গুরুদেব ভবিষ্যতের কত না কল্পনা করতেন।

যোগ্য শিষ্যের যোগ্যতায় গুরুদেবের মুখ উজ্জ্বল হয়।

মাত্র ষোল বৎসর বয়সে দিবো'কে চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের সুপুষ্ট আর্য-তরুণ বলে মনে হত। সকলেই বলত, ইন্দ্রের মহান কৃপা না থাকলে কি এমন হয়?

ঋষির প্রমুখ শিষ্য ভুজরু, কুৎস প্রভৃতি সকলে দিবোদাসকে তাদের স্বাভাবিক নেতা বলে ভাবত। কিন্তু দিবোদাস ওদের আপন ভাই অথবা সমান-মিত্র বলেই স্বীকার করত।

বিদ্যা এবং শাস্ত্র-শিক্ষা ছাড়াও ঋষির শিষ্যদের নানাপ্রকার কলা-কৌশল ও মনোরঞ্জন-শিক্ষা দোওয়া হত। সোমপান, সামগান, নৃত্য প্রভৃতি নিত্যকার মনোরঞ্জন বিভাগের প্রধান অঙ্গ ছিল। এ ছাড়াও ঘোড়া ও গরু চরানো, দুধ-দোওয়া এবং কৃষিকার্যে দিবোদাস ঋষির সহকারী ছিল। আখড়াতে নিত্য মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। এর মাধ্যমে যুদ্ধের নানাপ্রকার কলা-কৌশলের ব্যবহারিক অভ্যাস হত।

একবার দিবোদাস তার কয়েকজন সহপাঠির সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে বস্তী ছেড়ে উত্তর দিকের ঘোর জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। সেখানে পণিদের একটা বড় গোষ্ঠ ছিল। ওখনকার পণিদের মুখ্য আর্যকুমারদের খুব আদর-সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানায়। এমন সময় একজন দাস ছুটতে ছুটতে এসে বলল,—পাশের জঙ্গলে আমাদের

লাল ষাঁড়টা চরে বেড়াচ্ছিল এমন সময় একটা বিরাট সিংহ এসে তাকে মেরে ফেলেছে। ঐ ষাঁড়টি গ্রামের সকলের খুব প্রিয় ছিল। বেশ কিছুদিন যাবত ঐ সিংহটা মাঝে মাঝে একটা দুটো গরু বা বলদকে মেরে নিয়ে যেত।

গৃহপতিকে দুঃখ করতে দেখে দিবোদাস বলল,—আমরা সিংহকে মেরে তবে এখান থেকে যাব। পণি-গ্রামনী অনেক অনুনয় বিনয় করে বারন করে,—এই সিংহটা ভয়ানক হিংস্র, ওখানে যাবেন না। প্রথমতঃ মানুষের চোখের সামনে আসে না। আর একবার আক্রমণ করলে ওর হাত খালি যায় না।

আর্য কুমাররা ভয় পাবার পাত্র নয়। একটা সত্যিকার প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে লড়বার সুযোগ পেয়ে বরং ওরা খুশীই হয়। সকলেরই একমত। সিংহকে না মেরে এখান থেকে কেউ যাবে না।

গৃহপতির ওখানে বসে কিছু পান ভোজন সেরে ওরা তখুনিই যার যার ঘোড়ার পিঠে চেপে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হয়।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় ষাঁড়টির মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেল। সিংহের নাম গন্ধ নেই কোথাও। কিন্তু ওরা জানত শিকার খেতে সে নিশ্চয় আসবে।

একটা ছোট নালার পাশে ষাঁড়টি মরে পড়ে আছে। নালাটি সোজা বিপাশে গিয়ে মিশেছে। নালাটি এখান থেকে ক্রমশঃ চওড়া এবং গভীর। ওর দুদিকের জঙ্গলও খুব ঘন। আম জাম প্রভৃতি গাছ এত ঘন ঘন যে দিনের বেলাতেও সূর্যের প্রকাশ কোথাও কোথাও একটু আধটু দেখা যায় এবং তখন মনে হয় এখন দিন।

সিংহ নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে।

সকলে পরামর্শ করে কাছেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। ঘন গাছের পাতার আড়াল থেকে সিংহ ওদের নিশ্চয় দেখতে পাবে

না। সবচেয়ে আগে ওরা নিজেদের ঘোড়াগুলিকে আরো নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখে।

সকলে প্রস্তুত হয়ে সিংহের অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু সিংহ যদি একবার মানুষের গন্ধ পায় তাহলে হয়ত ওদের সকল চেষ্টা বিফল হয়ে যেতে পারে।

এখনো দুঘণ্টা দিন বাকী আছে। অথচ ওদের কাছে এতক্ষণ চুপকরে বসে থাকা অসম্ভব মনে হতে লাগল। এতটুকু শব্দ করবার উপায় নেই। সর্বদা দৃষ্টি রয়েছে শিকারের দিকে। মাঝে মধ্যে ইশারায় দু-একটা কথা যা বলতে পারছিল। তরুণ মনে সর্বদা এক চিন্তা। কতক্ষণে সিংহ আসবে আর তার সঙ্গে ওরা সামনা সামনি যুদ্ধ করবার সুযোগ পাবে।

বৎসরের সবচেয়ে ছোট দিন এখন। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা বাড়তে থাকে।

সূর্যের সাদা কিরণ ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসে। জঙ্গলের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার আরো নিবিড় হতে থাকে। গাছের উপরে পাখীর ডানা ঝটপটানির শব্দ। ওরা যে যার ঘরে ফিরে আসছে।

সময় যেন কাটতে চায় না। তবুও ধীরে ধীরে দিন আর রাতের সন্ধিক্ষণ এসে পৌঁছাল।

এক মুহূর্তে প্রকৃতি যেন পৃথিবীর উপর নিকষ কালো চাদর বিছিয়ে দিলেন। কোথাও কিছুই নজরে আসে না। চারিদিকে শুধু সূচীভেদ্য অন্ধকার।

তরুণদল শঙ্কিত হয়ে ওঠে। আজ রাত্রে চাঁদের দর্শন পাওয়া হয়ত সম্ভব নয়। তাহলে এই গাঢ় অন্ধকারে সিংহ যদি আসে ওরা দেখতে পাবে না।

কিন্তু না!

একটু পরেই নালার ওপারের নিচের দিকে খস্ খস্ করে যেন

একটু শব্দ হ'ল। ওরা দৃষ্টি শক্তির উপর বেশ জোর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। একটা কিছু যেন ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসছে। এত ধীরে ধীরে এবং সন্তর্পনে এগুচ্ছিল যে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল সেটাকে বিশ্বাস করতে।

এবার ওরা নিশ্চিন্ত হ'ল সিংহ তার শিকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক-দুই পা এগিয়ে যায়, অমনি থেমে চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নেয়। হয়ত কান খাড়া করে শুনছিল কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা।

কিন্তু ও জানেনা ওর সামনের পাতার আড়ালে ছয় জোড়া চোখ শ্যেনদৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছে। ও জানেনা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

তরুণদের মধ্যে এতবড় সিংহ কেউ জীবনে কখনো দেখেনি। ওদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। দেহের পেশীগুলি এক একবার ফুলে ফুলে উঠছে। মন চঞ্চল হয়ে উঠছে কতক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গলাটা টিপে ধরবে।

সিংহকে বার বার এদিক ওদিক তাকাতে দেখে মনে হ'ল ও নিশ্চয় কিছু একটা সন্দেহ করেছে। কিন্তু ওর এগিয়ে যাওয়া বন্ধ হয়নি। ধীরে ধীরে একপা একপা করে, তার পর বুকে হেঁটে শিকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ পর ও শিকারের কাছে আসতে পেরেছে। অন্ধকারের মধ্যেও তার চোখের জ্যোতি তরুণদের মনে আশ্চর্যভাব না জাগিয়ে পারেনি।

সিংহ এবার নিশ্চিন্তে শিকারের কাছে বসে এক এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে। তবুও ভীষণ সতর্ক। একবার খায় আবার একবার বাইরের দিকে দেখে নেয়।

দিবোদাস আর তার সাথীরা লক্ষ্যস্থির করছে।

দিবোদাস অবশ্য প্রস্তুত ছিল।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ হতে সিংহ এক লাফে পিছনে সরে যায়।

মনে হ'ল যেন শুকনো পাতার শব্দ আর সিংহের লাফ দেওয়া একই সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু আরো একটা কাজ হয়েছিল সেই সময়।

তা কেউ জানতে পারেনি।

দিবোদাসের অব্যর্থ তীর সিংহের ঠিক পাঁজড়াতে গিয়ে লাগে। পরিণামের কথা চিন্তা না করেই দিবোদাস এক লাফে গাছ থেকে নিচেয় নেমে আসে।

পশুসম্রাট সিংহ সামান্য একটা মানুষের এতখানি স্পর্দ্ধাকে সহ্য করতে পারে না। তাকে ফিরে আসতে হ'ল যেখানে দিবোদাস ছিল।

দিবোদাস এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল। বাঁ হাতে মজবুত ঢাল আর ডানহাতে তরবারী।

দুই প্রতিদ্বন্দীর দুই জোড়া জ্বলন্ত চোখের মিলন হয়। একের মনে অপরকে পরাস্ত করবার চিন্তা।

এক মুহূর্ত ভেবে নেয় দুজনে। তারপর সিংহ দিবোদাসকে লক্ষ্য করে এক লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে।

দিবোদাস বিদ্যুদ্বেগে পাশ কেটে সরে যায়।

আহত সিংহ স্বয়ং কালান্তকের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যেখানে দিবোদাস দাঁড়িয়েছিল সিংহ সেখানে এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে দিবোদাস সিংহের ঘাড়ে উপর ভীষণ জোরে আঘাত করে।

পর পর দুটি আঘাতই খুব জোর হয়েছিল। তবুও সিংহ আবার দিবোকে আক্রমণ করে। এবার দিবো সিংহের বাঁদিকে ঘাড়ের উপর আঘাত হানলো। ইতিমধ্যে গাছের উপর থেকে অন্য সাথীরা নেমে সিংহকে আক্রমণ করল। দিবোদাস সঙ্গীদের সিংহের শরীরে

আঘাত করতে বারন করে বলে সে একাই ওকে শেষ করবে। কিন্তু সাথীরা ওর কথায় কান না দিয়ে এক সঙ্গে বর্শা মেরে সিংহকে ধরাশায়ী করে।

দিবোদাস একাই সিংহের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। লড়াই শেষ হবার পরেও দিবোকে দেখে এতটুকু মনে হয়নি যে সে এতবড় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে জীবন-মরণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। যেন কিছুই হয়নি এমনি ধীর, স্থির। যেন আখড়ায় যুদ্ধের প্যাঁচ শিখছে।

সঙ্গীরা সিংহকে স্থির দেখে দিবোদাসের কাছে এসে পরীক্ষা করে দেখে ওর শরীরে কোনো আঘাত লেগেছে কিনা। এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি ওর শরীরে।

ওদের কাছে সিংহের মৃতদেহের চেয়ে বড় উপহার আর হতে পারেনা। তাই একে ফেলে রেখে যাওয়া চলে না।

শেষ আঘাত করবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সিংহের দেহ স্থির হয়ে যায়। তখুনি সকলে যার যার ছুরি বের করে সিংহের চামড়া ছাড়াতে লেগে গেল। একাজে ওরা সকলেই পটু ছিল। এর আগে বহু জন্তুর চামড়া নিজের হাতে ছাড়িয়েছে।

আজকার সিংহের শরীর অসাধারণ বড় ছিল। খুব মনোযোগ দিয়ে একাজ করে ওরা। চামড়া দিয়ে ওদের অনেক কাজ হয়। তাছাড়া সিংহের চামড়াকে ত মহার্ঘ বস্তু বলে জানে সকলে।

শুধু চামড়া হলেও একেবারে টাটকা বলে বেশ ভারী। দিবোদাসের তরবারীর পর পর দুটি আঘাত সিংহের ঘাড়ে লেগেছিল বলে সেখানটায় অর্দ্ধেকের বেশি কেটে গিয়েছিল। তাই মাথাটা আলাদা করে নেওয়া হল।

দিবোদাস নিজে আগ্রহপূর্বক নিজের ঘোড়ার উপর মাথাটা নেয়। বাকী সব গ্রামের লোক যারা এসেছিল তাদের ঘোড়ায় চাপিয়ে দিয়ে সকলে রওয়ানা হয়।

ওরা যখন পণিগ্রামে এসে পৌঁছয় তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পণিদের এই গ্রামটিকে সত্যিকার গ্রাম বলা যায়। শুধু কুঁড়ে ঘর নয়। গ্রামটি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু।

গ্রাম-মুখ্যের ঘরটি পাকা ইটের তিনতলা কোঠাবাড়ী। তাছাড়া বেশির ভাগ বাড়ীই ইট এবং মাটির তৈরী। উপরে কাঠ বিছিয়ে মাটি দিয়ে ছাদ তৈরী।

যদিও প্রভুজাতি আর্যদের নিষেধ ছিল তবুও ওদের এই গ্রাম অন্যরকম উপায়ে তৈরী।

প্রতিটি বাড়ীর সঙ্গে প্রতি বাড়ী পাশাপাশি তৈরী। পুরো গ্রামটি এমনি গোল করে তৈরী যে বাড়ী এবং প্রাচীরের কাজ একই সঙ্গে হয়েছে। একটা মুখ্য দরজা রয়েছে গ্রামের। গ্রামের মধ্যে সারিবদ্ধ অন্যান্য বহু বাড়ী আছে। তার ঠিক মাঝখানে গ্রাম্য সরদার বা মুখ্যের বাড়ী। চমৎকার ভাবে সাজানো গোছানো।

প্রতিরক্ষার এই প্রচেষ্টা শুধু ছোট খাট লুঠ-পাট বা চুরির ভয়ে। নতুবা আর্যজাতির কাছে এ প্রচেষ্টা কিছুই নয়।

গ্রাম্য সরদার বেশি রাত হতে দেখে নানা আশঙ্কা করতে থাকে।

হয়ত আর্য তরুণ বীরেরা সিংহের কবলে বিপদে পড়তে পারে। যদি সত্যিই তেমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে আর রক্ষা নেই। আর্যরা নিশ্চয় মনে করবে একাজে পণিদের হাত রয়েছে।

তাহলে একমুহূর্তে এই বিশাল গ্রামের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠবে আর শত শত নিরপরাধ পণি শিশু বৃদ্ধের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

একটু একটু করে রাত্রি বাড়ে আর সরদার চঞ্চল হয়ে ওঠে। একবার ছাদে আর একবার বাড়ীর আঙিনায় ছুটাছুটি করতে থাকে।

সপ্তসিন্ধুর মহাবীর বভ্রযশের পুত্র এবং ভরত জাতির ভাবী রাজার যদি বিপদ হয় তাহলে সমগ্র সপ্তসিন্ধু একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে

পড়বে এই দুর্বল জাতির উপর এবং একদিনে এদের নাম গন্ধ মুছে যাবে এই ভারতের বুক থেকে।

রাত্রি অর্ধেক হয়ে যায়। এখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সরদার ছুটে আসে নিচেয়।

উন্মাদের মত চীৎকার করে ওঠে,—কে কোথায় আছিস? সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ ষাট জন লোক ছুটে আসে। সকলে মাথা নিচু করে সরদারের আদেশের অপেক্ষা করতে থাকে।

—সমস্ত গ্রামে বিপদের সূচনা জানিয়ে দাও। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখনো আর্য বীর তরুণরা ফিরে এলোনা। নিশ্চয় তাদের কোনো বিপদ হয়েছে।

হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভীষণ শব্দে কাড়া-নাকড়া বেজে ওঠে। সেই শব্দে সমস্ত পণিগ্রাম সচকিত হয়ে ওঠে। ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করে গ্রামের সমস্ত লোক যার যেমন অস্ত্র-শস্ত্র আছে নিয়ে ছুটে আসে সরদারের বাড়ীর সামনে।

ঢাকের অদ্ভুত শব্দ ক্রমাগত বেজে চলেছে। দূর-দূরান্তরে যে যেখানে আছে, যার কানে এই শব্দ পৌঁছুচ্ছে সেই সচকিত হয়ে আসন্ন বিপদের সন্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়।

পণিগ্রামের সকল স্ত্রীরা তাদের স্বামীকে বিপদে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করে কাড়া-নাকড়ার অদ্ভুত সুর।

ছোট ছেলেরা ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কুঁকিয়ে কেঁদে ওঠে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শত শত পণিযোদ্ধা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। সকলের আগে মশাল হাতে পথ-প্রদর্শক। তার পিছনে সরদার স্বয়ং।

এমনি সময়ে দূরে কুকুরের ডাক শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কুকুরগুলি ডাকতে ডাকতে সেই দিকে ছুটে যায়।

শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হতে হতে কাছে এগিয়ে আসছে।

সকলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে।

সরদারের আদেশে কয়েকজন অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায় সংবাদ জানবার জন্য। তখুনি তারা ফিরে এসে জানায়, সকলে অক্ষতদেহে সেই সিংহটাকে মেরে ফিরে আসছে।

এক পলকে সব কিছু ওলট পালট হয়ে যায়। সরদারের আদেশে কাড়া নাকাড়ার সুর পালটে গিয়ে অন্য সুর বাজতে থাকে। পণিগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

প্রস্তুত যোদ্ধারা যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে বীর আর্যকুমারদের স্বাগত জানাবার জন্য ঘোড়া থেকে নেমে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। সরদার নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রধান গ্রাম্যদরজার পথে বেরিয়ে যায়।

আর্য বীরেরা গ্রামে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের চীৎকারে সমস্ত গ্রাম জম জম করতে থাকে। সরদার বীর-বন্দনা করে নিজে আসন দেয় কুমারদের বিশ্রাম করবার জন্যে। সরদারের আদেশে পণিদের সবচেয়ে দামী সুরা এনে ওদের সামনে রাখা হয়।

পূবের আকাশে ঊষাদেবী তখন মুখ বাড়িয়েছেন।

আর্য কুমাররা নিজেদের এতবড় সফলতার জন্য আগে ইন্দ্রের বন্দনা করবার ব্যবস্থা করে। সিংহদ্বারা মৃত ষাঁড়ের মাংস আর সোম দিয়ে আগে ইন্দ্রের বন্দনা করে, ইন্দ্রকে দান করে, তবে নিজেরা সোমপাত্র মুখে তোলে।

পণিজাতি যদিও আর্যযোদ্ধার বীরত্বের কাহিনী জানত কিন্তু আজকার এই বিরাট শিকার স্বচক্ষে দেখে আর্যদের ওপর ওদের শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পায়।

আরো খানিক বেলা বাড়তে পণিসরদার ও বহু পণিযোদ্ধা সসম্মানে আর্যকুমারদের আশ্রম অবধি পৌঁছে দিয়ে আসে।

আশ্রমে ফিরে এসে ঋষিদের সামনে দিবোদাস অত্যন্ত বিনম্রতার

সঙ্গে বলল,—না, এমন আর কি করেছি। ছয়জনে মিলে একটা বুনো পশুকে মারা এমন আর কি বীরত্ব। দিবোদাস এর বেশি আর কিছু বলে না। কিন্তু ওর সঙ্গীরা দিবোদাসের একলা সিংহ শিকারের কাহিনী যখন সজীবভাবে বর্ণনা করে তখন ঋষিকুল আশ্চর্য না হয়ে পারে না।

অশ্ব-সমন বিজেতা বীর দিবোদাস সেই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্তে যেমন ধীর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিল তা দেখলে মনে হত যেন একটা খেলনার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আঘাত করছে।

ভুজ্যু এবং কুৎস দিবোদাসের সফলতাকে নিজেদের সফলতা মনে করত। তাই কোনো বীরত্বের কাহিনীর অবতারণা হলেই ওরা দিবোদাসের সেই সিংহ শিকারের সজীব কাহিনী না শুনিয়ে পারত না।

ভরদ্বাজ কুলে বহুকাল যাবত এই কাহিনী সকল নর-নারীর মুখে মুখে ঘুরে বেড়িয়েছে।

ভরদ্বাজ ঋষি তাঁর শিষ্যদের মনে আর্যজাতির পূর্বপুরুষদের পরাক্রমের কাহিনী স্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। তাই কথার ছলে তাঁর মেধাবী শিষ্যেরা কখনো কখনো নিঃসংশয়ে প্রশ্ন করত। এমনি একবার আর্জুনেয় প্রশ্ন করল,—আর্যদের উৎপত্তি কেমন করে হ'ল?

—মহান ইন্দ্র থেকে আর্যের উৎপত্তি হয়েছে। বললেন ঋষি। ইন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয় পুত্র আর্য, কারণ আর্যেরা ইন্দ্রের অনন্য ভক্ত। যদিও কিলাত, নিষাদ, পণি প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি ইন্দ্রের থেকে হয়েছে তবে তারা ইন্দ্রকে ভক্তি করে না বলে ইন্দ্রও তাদের ভালবাসেন না। তাই ওরা কৃতঘ্ন। এবার ভুজ্যু প্রশ্ন করে—

—আমাদের দেহের গঠন লম্বা, চওড়া। শরীরের রং গৌরবর্ণ,

চুল সোনালী আর চোখ নীলবর্ণ এ আমরা বুঝি। কিন্তু অন্যদের বেলায় তা নয় কেন ?

—এও ইন্দ্রের মহিমা। তিনিই পণিদের রং-রূপ মাগুর মাছের মত করেছেন, নিষাদদের করেছেন কয়লার মত আর কিলাতদের চ্যাপ্টা নাক এবং গোঁফ-দাড়ীহীন করেছেন। এর একমাত্র কারণ হ'ল এই প্রভেদের দ্বারা তিনি তাঁর ভক্ত এবং অভক্তদের চিনে নেবেন।

—তাহলে একই দেশে একই কালে এই চার জাতির সৃষ্টি করেছেন সেই পরম পুরুষ মহান ইন্দ্র ?

—এ সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলা কঠিন। আর্য সপ্তসিন্ধুর পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এমনি যারা ইন্দ্রের স্নেহের পাত্র তারাই ভারতের বুকে অধিকার স্থাপন করবে। নিষাদ এবং কিলাত সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষ। মনু'র সন্তান নয় বলে ওদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করা যায় না। এই দুই জাতিই জঙ্গল এবং পাহাড়ে বাস করে। শিকার ওদের জীবিকার প্রধান অঙ্গ। এখনো পাথরের অস্ত্রের প্রচলন বেশি ওদের মধ্যে।

—কিন্তু পণিরা ত সে রকম নয়। বলে দিবোদাস।

—হ্যাঁ, বস্তুতঃ পণিরা আমাদের চেয়ে খুব নিকৃষ্ট নয়। তবে ওরা ইন্দ্রের ভক্ত নয় বলে ইন্দ্র ওদের ভূমি আর্যদের অধিকারে দিয়েছেন।

—তাহলে আর্যদের আসবার আগে কেউ ইন্দ্রপূজা করত না ?

—তাই ত ইন্দ্র আর্যদের পাঁচ জন-এ ভাগ করে এক একদিকের ভার দিয়েছেন। পণিদের সঙ্গে বড় বড় সঙ্ঘর্ষ হয়েছে। সৌভাগ্য-বশত আর্যরা মনুর মত সেনানী পেয়েছিল। কিন্তু পণিদের সেনানী বিষশিপ্রও কম ছিল না। তখন যদি স্বয়ং ইন্দ্র যুদ্ধে যোগ না দিতেন তাহলে ঐ কালো জাতিকে পরাজিত করা কঠিন হত নিশ্চয়।

পণিদের বড় বড় স্থায়ী নগর ছিল। ওদের কাছে ছিল তামার তৈরী তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র। আমাদের মত বড় বড় যোদ্ধা যদিও ওদের ছিল না কিন্তু যোদ্ধার সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেকগুণে বেশি ছিল।

—এত কিছু থাকতেও ওরা পরাজিত হল কেমন করে? বলল দিবোদাস।

—তার সবচেয়ে প্রধান কারণ হ'ল ইন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরই কৃপায় আমরা অশ্ব পেয়েছিলাম। পণিদের কাছে অশ্বের সবচেয়ে বেশি অভাব ছিল। তারপর আমাদের প্রত্যেক যুবক ও প্রৌঢ় বীর যোদ্ধা ছিল এবং মনু'র মত নেতা ছিল।

—পণিদের পরাজিত হবার আর একটা কারণ ছিল সুন্দর সুখময় নগরীতে আরামে বাস করতে করতে ওরা আলসে এবং যুদ্ধবিমুখ হয়ে গিয়েছিল। বলল কুৎস।

---ঠিক তাই। তাইত অমন সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ নগরী জয়লাভ করেও আমরা সেখানে বাস করি না। সুন্দর, সুখী নাগরিক জীবনের চেয়ে পৌরুষপূর্ণ আরণ্যজীবনই আমরা পছন্দ করি। যেখানে আমাদের ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুরা স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে পারে। সেখানে আমাদের অস্ত্রে মরচে পড়বার সুযোগ পায় না। আমাদের পুরুষরা আরাম পছন্দ করে না, আমাদের স্ত্রীরা পরিশ্রমে বিমুখ নয়। তাই আমরা পণিদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকি। আলস্য আর আরামের জীবন ভয়ানক ছুঁত্ রোগ বলে মনে করি আমরা।

—সংসর্গে থাকলে আমাদের আরো হানি হত।

—হ্যাঁ, যথেষ্ট চেষ্টা করেও আমরা পুরোপুরি নির্লেপ থাকতে পারিনি। যদিও এ বিষয়ে আর্য নারীদের প্রশংসা করা যায়, কিন্তু আর্য পুরুষদের কথা জোর করে বলা যায় না। তাদেরই দোষের জন্য অনার্যদের মধ্যে আর্য বর্ণের সন্তান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।-

প্রথম প্রথম তারা মনে করেছিল সেই সব অনার্য সন্তান অনার্যদের মধ্যেই থেকে যাবে। কিন্তু এমন অনেক দেখা গেছে সেই সকল অনার্যসন্তানরা অন্য জনে গিয়ে নিজেকে আর্য পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে গেছে। এই অবস্থা যদি সমূলে বিনাশ করা না যায় তাহলে আর্যদের মধ্যে বর্ণসঙ্করতা প্রবেশ করে আমাদের ভীষণ সর্বনাশ সাধিত করবে।

—এর প্রতিকার কি, গুরুদেব?

—এর একমাত্র প্রতিকার হল আর্য স্ত্রী-পুরুষদের সঙ্গে অনার্য স্ত্রী-পুরুষদের মেলামেশা একেবারে সহ্য না করা।

—কিন্তু অনার্য দাস-দাসীদের ছাড়া আমাদের কাজ ত চলতে পারে না। বলল ভুজ্যু।

—সেইখানেই ত আমাদের দুর্বলতা। সেইদিক দিয়েই হয়ত ভবিষ্যতে আমাদের বিপদ আসবে। তবে আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি ইন্দ্র আমাদের বীরত্ব-শুদ্ধতা রক্ষা করবেন। এতদিন তিনিই আমাদের রক্ষা করে এসেছেন। এমনি করে পুরুরুবার সময়ে পণিরা একবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ইন্দ্রের সহায়তায় সেবার পণিদের চেষ্টা সফল হয়নি। তাঁর পুত্র নহুস সেই যুদ্ধে এমন পরাক্রম দেখিয়েছিল যার জন্য সেই যুদ্ধের পর থেকে মানুষকে নাহুষীপ্রজা বলা হয়। সেই থেকে নহুসপুত্র যযাতি আর দস্যুহন্তা মান্ধাতা তাদের বীরত্বের জন্য এবং ইন্দ্রের উপর ভক্তির জন্য আজও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

দিবোদাস খুশী হয়ে আশা প্রকাশ করে বলে,—আমার মনে হয় আর্যদের নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। তাদের নেতৃত্ব করবার জন্য স্বয়ং ইন্দ্র আগের মতই প্রস্তুত রয়েছেন।

ইন্দ্র তাঁর ভক্ত আর্যদের ইন্দ্র বিমুখতা সহ্য করতে পারেন না। যদি কখনো কেউ তেমন অন্যায় করে তাহলে তাকে তিনি দণ্ড দিয়ে থাকেন।

দিবোদাসের ঋষিকুল বাসের শেষ সময়ে এমনি একটি ঘটনা ঘটল।

গ্রীষ্মের শুরু হয়েছে। সূর্যের তেজ ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠছে। ভরদ্বাজ গ্রামের পাশের খেতের ফসল কাটা শেষ হয়েছে। যবগাছের গোড়াগুলি ইতিমধ্যেই পশুরা খেয়ে সমান করে ফেলেছে। গ্রীষ্মের দুপুরে খর রৌদ্রে খেতের দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়।

তারই খানিকটা দূরে ঘনজঙ্গলের মধ্যে গ্রীষ্মের প্রখরতা অনেক কম। পলাশের নতুন নতুন সবুজ পাতাগুলি দেখতে খুব সুন্দর লাগে এ সময়। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বিশাল গাছগুলি রৌদ্রের হাত থেকে যেন বাঁচিয়ে রেখেছে। ভর দুপুরে পশুগুলি চরতে চরতে পরিশ্রান্ত হয়ে এই গাছের তলার ছায়ায় দাড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাদের সঙ্গে রাখাল বালক বা যুবকরা বিশ্রাম করে। মাঠের পাশে জঙ্গলের সীমানায় গাছতলায় এমনি কত রাখাল ঘুমিয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সব অঞ্চলে রাতের বেলাতেও শ্বাপদ জন্তুর ভয় নেই। তাই দিনের বেলায় মোটেই কোনো চিন্তা নেই কারো মনে।

দিবোদাস তার কয়েকজন সাথীর সঙ্গে জঙ্গলের সীমানায় বিরাট একটা আমগাছের তলায় বসে বিশ্রাম করছিল। এসময়ে মাঠের মধ্যে গরু, ভেড়া একরকম নেই বলা যায়। বেশির ভাগ সকলে গাছের তলায় ছায়ার আশ্রয় নিয়েছে।

ওদের মধ্যে আলোচনা চলছিল, এবার আমের ফলন এত বেশি হয়েছে যে কয়েকদিন পর আম কেউ আর ছোঁবে না। তাছাড়া মানুষ যখন আমের চাষ সম্বন্ধে চর্চা করবে তখন ত কথাই নেই। আজ পর্যন্ত এদিকে আমরা তেমন মনোযোগ দিইনি। তাই প্রকৃতি যাকে মিষ্টি করেছেন সেই মিষ্টি, প্রকৃতি যাকে টক করেছেন সে টক, এবং ছোট বড়র বেলায়ও প্রকৃতির খেয়ালের উপরই এখনো মানুষ নির্ভরশীল।

এমন সময় হঠাৎ গ্রামের দিক থেকে কোলাহলের শব্দ ভেসে আসে। ওরা সচকিত হয়ে শুনতে চেষ্টা করে।

কোলাহল ক্রমশ বাড়তে থাকে। দিবোদাস এবং ওর সঙ্গীরা বিপদের আশঙ্কা করে ঘোড়ার পিঠে চেপে গ্রামের দিকে ছুটে যায়।

কিছুদূর যেতেই ওদের নজর পড়ে নদীর দিকে। গ্রামের অনেক মানুষ নদীর তীরে জমা হয়েছে। তা ছাড়া সবচেয়ে আগে যেটা চোখে পড়ে তা হ'ল সকালে নদীর যে চেহারা ওরা দেখেছিল এখন তার দ্বিগুণ মনে হচ্ছে।

কৌতুহল বাড়তে ওরা আরো তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের দিকে যায়। যাবার পথে ওরা সবিস্ময়ে দেখল গ্রামের নিচের দিকের যতগুলি গোষ্ঠ বা পশুশালা ছিল তার মধ্যে এক হাতেরও বেশি জল জমেছে।

তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে জল বাড়ছে।

গ্রামের ভিতর থেকে গরু-বাছুরের করুণ আর্তনাদ কানে আসছে। নিচের খোঁয়াড়গুলি দেখতে দেখতে জলে ভরে যায় এবং গরু-বাছুর সব সাঁতরে উপরের দিকে যাবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে, কিন্তু মজবুত বেড়া পার হতে পারছে না।

জল হু হু শব্দে বেড়েই চলেছে। লোকজন যে যার ঘরের জিনিষ-পত্র নিয়ে উঁচু জায়গার দিকে যাবার জন্য ব্যস্ত। সকলে আতঙ্কিত হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করছে।

প্রাণ ভয়ে সকলে সশঙ্কিত।

আর্জিকিয়ার দিকে এখন আর তাকানো যায় না। চারিদিকে শুধু জল আর জল। দিবোদাস আর তার সঙ্গীরা রাস্তার পাশের সকল খোঁয়াড়গুলির বেড়া কেটে দিয়ে পশুগুলিকে মুক্ত করে এগিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে ঋষির পর্ণশালার আঙিনায় জল জমে গেছে।

গ্রামের [illegible] যারা ছিল তারা জলের বৃদ্ধি দেখে ঋষির কুটিরের সামনে এসে জড়ো হয়। ঋষি ভরদ্বাজও প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এ সময় আজ পর্যন্ত কখনো বন্যা দেখা যায়নি, তাই আশ্চর্য হবারই কথা। তবুও জল যতক্ষণ বিপদ সীমা অতিক্রান্ত না হয় ততক্ষণ সকলে অপেক্ষা করে। তারপর বিপদ বুঝে খাদ্য সামগ্রীগুলি প্রথমে উঁচু জায়গায় সরিয়ে ফেলবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

তবুও ছাতু এবং যবের যথেষ্ট ক্ষতি হল। তবে পশুহানি হয়নি ঋষি কুলের। ঘরের সামগ্রী প্রায়ই নষ্ট হল। অত তাড়াতাড়ি সব সরিয়ে ফেলার সুযোগ হ'ল না।

সকলে তখন উন্মাদের মত যে যার প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য ছুটছে। আর তার পিছনে অজগরের মত তাড়া করে নিয়ে চলেছে বন্যার জলের বেগ। বিপাশের জল এতদূর আসতে শোনা যায়নি কখনো।

ঋষি ভরদ্বাজ উপরে জঙ্গলের এক বিশাল গাছের উপর আশ্রয় নিয়েছেন। এই গাছে আশ্রমের বহু শিক্ষার্থী আশ্রয় নিয়েছে। জঙ্গলের প্রায় সকল বড় গাছে এমনি সহস্র সহস্র মানুষ আশ্রিত।

তবু কতলোক যে আশ্রয় পায়নি তার কোনো হিসাব নেই।

সে দৃশ্য দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। বন্যার তীব্র স্রোতে কত গরু, ভেড়া যে ভেসে চলেছে তা ভাবতেও শিউরে ওঠে ওরা। শুধু পশু নয়, কত মানুষ এমনি মৃত অর্দ্ধমৃত ভেসে চলেছে। তার সঙ্গে অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্রোতের টানে এলোমেলো ভাসছে।

সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছেন।

এই সামান্য সময়ে যে এতবড় বিপর্যয় হতে পারে তা কেউ কল্পনাও করেনি। এখনো জলের বেগ ঠিক তেমনি রয়েছে। হয়ত

এই বড় গাছগুলিও কয়েক মুহূর্ত পরে মড় মড় শব্দে ভেঙ্গে গিয়ে ভেসে যাবে। আর তার সঙ্গে এই মানুষগুলির কোনো চিহ্ন থাকবে না। হয়ত অন্য জনপদ যখন এ সংবাদ পাবে তখন ভরদ্বাজ কুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তবুও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

ঋষি সকলকে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,—আর্যরা তাদের ধর্মকর্ম ভুলে গিয়েছিল। তাই ইন্দ্র অকালে এই বন্যা পাঠিয়ে আমাদের সমুচিত দণ্ড দিলেন। আজ সকালেও কেউ ভাবেনি এই বিপর্যয়ের কথা। এখনো আকাশে এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই বা একটুকরো মেঘ নেই। পরিষ্কার নীল আকাশ! এ সময়ে নদীতে বাণ আসতে পারে না।

সকলে মনে রেখ ইন্দ্র বিপাশকে পাঠিয়েছেন আমাদের দণ্ড দেবার জন্য। পাপীদের বিনাশ করবার জন্য।

অতএব এখনো সকলে ভক্তিভাবে ইন্দ্রকে ডাকো। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। বলো—হে মহাত্মা ইন্দ্র! আমাদের ক্ষমা কর। তোমার রোষদৃষ্টি থেকে আমাদের রক্ষা কর। আমরা সর্বান্ত-করণে তোমার অনুগত। তোমারই শরণাগত। রক্ষা করো।

ঋষির সঙ্গে আশপাশের গাছ থেকে শত শত আর্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়,—রক্ষা করো হে ইন্দ্র! রক্ষা করো।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন একটু একটু করে তার মায়াজাল বিস্তার করছে। একদিকে জলের কল কল শব্দ আর অন্যদিকে ইন্দ্রবন্দনার গুঞ্জন ধ্বনি।

## ॥ পাঁচ ॥

"অগ্নিনরনামী বৃত্রহা পুরুচেতন দিবোদাসস্য সৎপতিঃ"

[ খৃঃ পূঃ ১১৯৫ ]

সেদিনকার সেই ছোট্ট দিবোদাস এখন কুড়ি বছরের যুবক। সেদিনকার মত আজও তাকে দেখলে তার বয়সের চেয়েও পাঁচ-সাত বছর বড় মনে হয়।

ভরদ্বাজ ঋষির কাছে দিবোদাসের যা কিছু শিখবার ছিল তা সবই শেখা হয়ে গেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দিবোদাস সেই অশ্বের গতির মতই সহপাঠীদের ছাড়িয়ে প্রথম হওয়া বজায় রেখেছে। শুধু শিক্ষায় বললে সব বলা হয় না, শিকারের সময়েও দিবোদাস ছিল সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিমান।

ঋষিপুত্র গর্গও তার যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান।

এই দুইজনের মধ্যে ঋষি কাকে বেশি স্নেহ করতেন তা বলা কঠিন। ঋষি জীবনে কাউকে আলাদা করে দেখেননি। তাঁর কাছে সকলেই সমান। একজন সাধারণ শিক্ষার্থী ঋষির উপর ততখানি অধিকার রাখত যতখানি ঋষিপুত্র গর্গ।

ঋষি ভরদ্বাজ "ব্রহ্মদ্রষ্টা" পুরুষ ছিলেন। মন্ত্র এবং দেবতা, দুজনের সঙ্গেই সাক্ষাতকার করতে সমর্থ তিনি। তিনি শুধু পুরোহিত ছিলেন না, যুদ্ধবিদ্যায়ও তেমনি নিপুণ ছিলেন—যতখানি ছিলেন অন্য বিদ্যায়।

মহাঋষি ভরদ্বাজ আর্যজাতির প্রতীক।

নিজেদের মধ্যে দলাদলির জন্য আর্যজাতি জর্জরিত। এজন্য অনেক শত্রু মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

বভ্রযশ্বও আর্য প্রভুত্বকে সুরক্ষিত রাখতে সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছে। কিন্তু কাজ শেষ করতে পারেনি।

ঋষি ভরদ্বাজের দিনরাতের চিন্তা এবং চেষ্টা ছিল কেমন করে তারা আরো শক্তিশালী হবে এবং অপরাজিত শত্রুকে নতমস্তক করা যায়। সেই ভাবনা তিনি তাঁর শিষ্যদের মনের মধ্যে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্ঠা করতেন।

দিবোদাস, ভুজ্যু, কুৎস, কুরুবিন্দ প্রভৃতি যোগ্য শিষ্যদের উপর ঋষির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তারা গুরুপ্রদর্শিত পথে চলবে এবং জাতির মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

সেদিন ঋষি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে জাতির সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে সংবাদ দেয় বভ্রযশ্ব স্বর্গারোহণ করেছেন। ঋষি এবং সমগ্র কুল এই সংবাদ শোনামাত্র শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। যেন কত আপনার জনের বিয়োগান্ত হয়েছে। বসন্তের সুন্দর দিনটা বিষাদের কালো ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়।

দিবোদাস ছিল ধৈর্যের প্রতীক।

তবুও তার অত্যন্ত প্রিয় পিতার চিরকালের বিয়োগ ব্যাথায় কাতর হয়ে পড়ে। ওর হৃদয়ের উপর যেন দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে।

ঋষি সান্তনা দিয়ে বলেন,—জন্ম-মৃত্যুর উপর আমাদের কারো হাত নেই পুত্র! জন্মালে মরতে হবে। এ পৃথিবীতে যা জন্মায় তার মৃত্যু অবধারিত। এইটাই চিরন্তন সত্য, আর সব মিথ্যা। যদিও বভ্রযশ্ব আমার চেয়ে বয়সে ছোট ছিল তবুও সে বৃদ্ধ হয়েছিল। আজ নয়ত কাল, মৃত্যু একদিন না একদিন হত্তই। সকলেরই পূর্বপুরুষগণ উপরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের মুখ চেয়ে তাকিয়ে আছেন। তাই তার মৃত্যুতে শোক করবার কিছু নেই।

তোমার পিতা যে কাজ করেছেন তাতে চিরকাল তিনি সমগ্র আর্যজাতির মনের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। তিনি যা করেছেন তা মনু-মান্ধাতার চেয়ে কম কিছু করেননি। তোমার মত সুপুত্রকে সপ্তসিন্ধুর মঙ্গলের জন্য দান করে গেছেন। তাই তার মত ভাগ্যবান পুরুষের বিয়োগে যদিও আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, তবুও তিনি অকালে আমাদের ছেড়ে যাননি এটাই সুখের কথা। এখন বিয়োগব্যাথা ভুলে গিয়ে তোমার কর্তব্যের কথা চিন্তা কর। তোমার সামনে বিরাট পাহাড়-প্রমাণ কর্তব্য রয়েছে, সেই ভার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও। পিতৃ বিয়োগের ব্যাথা কিছু সময়ের মধ্যে ভুলে যাবে। অতএব এখন থেকেই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো। ইন্দ্র তোমার মঙ্গল করবেন, তিনিই তোমাকে দিয়ে সপ্তসিন্ধুর আর্যজাতির ভবিষ্যত ভাগ্য নতুন করে গঠন করবেন।

বধ্রযশ্ব সুপুত্র জন্ম দিয়েছেন। আজ শুধু তৃৎসু বা ভরত জাতিই নয়, সমগ্র আর্যাবর্ত তোমার কষ্টে সহানুভূতি রাখে। সকলেই তোমার উপর আশা করে অপেক্ষা করছে। তৃৎসু জাতির বৃদ্ধরা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনা করে আমাকে সংবাদ দিয়েছে। আমার ইচ্ছা যথাসম্ভব শীগগির তোমাকে নিয়ে গিয়ে অভিষেক করিয়ে আনি।

ঋষির সান্ত্বনায় দিবোদাস অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হয়।

বাতাসের আগে খবর ছড়ায়। বধ্রযশ্বের মৃত্যু সংবাদও দেখতে দেখতে সমগ্র আর্যাবর্তে ছড়িয়ে পড়ল। বধ্রযশ্বের ভক্ত যারা ছিল তারা চোখ মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারাও এবার দিবোদাসের কথা ভাবতে থাকে।

যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য। দিবোদাসই তাদের মহান নেতার পদ অলংকৃত করবে।

ভরদ্বাজ আশ্রমের সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংবাদ পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ঋষিপুত্র গর্গ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুজ্যু, কুৎস প্রভৃতি দিবোদাসের একাত্মা সহপাঠি যারা ছিল তারা ঋষির কাছে এসে দিবোদাসের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। ঋষি সানন্দে অনুমতি দিলেন।

তারপরদিনই ঋষি কুলের অর্দ্ধেক শিক্ষার্থী দিবোদাসের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

গুরুপত্নী দিবোদাসকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তিনি নিজে ছিলেন ভরত-জন-এর কন্যা। তাই সকলের চোখের জল শুকিয়ে গেলেও তাঁর চোখের জল যেন থামতে চায় না। একান্ত আপন জনের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন।

অগত্যা ঋষি ভরদ্বাজ স্বয়ং ভরত-জনপদে যাবার জন্য স্বীকৃত হলেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু আগে ভরদ্বাজ কুল থেকে কয়েক শত ঘোড়া ও অন্যান্য কিছু পশুসহ বিরাট এক যাত্রীদল ভরত-জনের উদ্দেশে রওয়ানা হয়।

গুরু, গুরুপত্নী, পুত্র, কন্যা স্নুষা একশ'য়েরও বেশি গুরুভাই এবং তাদের জিনিষপত্র ও পশু প্রভৃতি দেখা শোনার জন্য বহু দাস দাসী চলল যাত্রীদলের সঙ্গে।

ভরত জাতির রাজার জন্য একটা নিশ্চিত বাসস্থান ছিল। তাই বলে পণিদের মত কোথাও স্থায়ী বাসগৃহ ছিল না। প্রয়োজনে দু-চার দশদিন বাস করবার জন্য ঐ নিশ্চিত বাড়ীতে আসতে হত। তাছাড়া বাকী সময় কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকত না কোনো আর্য জাতির।

ভরত জাতির যে কোনো সমারোহ, অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোক না কেন সবই হ'ত পরুষ্ণী বা রাবী নদীর তীরে। প্রতি বৎসর

অশ্বসমন মেলা এই পরুষ্ণীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আজও বধ্রযশ্বের শেষকৃত্য এই নদীর তীরে আয়োজিত হয়েছে।

পরুষ্ণীর তীরে এসে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না ওদের। যাত্রীদল ধীরে ধীরে আসছে। শুধু দিবোদাস, ভরদ্বাজ ও কয়েক-জন বিশেষ ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালিয়ে পরদিনই এসে পৌঁছাল।

পৌরবীর ধৈর্যের বন্ধন এবার ছিঁড়ে পড়ে। দিবোদাসকে দেখেই ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

দীর্ঘদিন পর মাতা-পুত্রের মিলন হ'ল। তাও ভীষণ এক বিষাদময় পরিবেশের মধ্যে। পৌরবীর কত কথা আজ মনে পড়ছে। বধ্রযশ্বের অনেক আশার ধন দিবোদাস। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা দিবোদাস। মৃত্যুসময়ে পুত্রকে সংবাদ দিতে বারণ করেছিলেন বধ্রযশ্ব। পিতার অসুস্থতার সংবাদে দিবোদাসের শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবে। মৃত্যু সময়ে পৌরবী লক্ষ্য করেছিল কী ভীষণ কষ্টে বধ্রযশ্ব তাঁর প্রিয়তম পুত্রের দর্শন কামনাকে দমন করে রেখেছিলেন।

ঋষি পৌরবীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন,—এখন সবচেয়ে আগে শবদাহক্রিয়া এবং দিবোদাসের অভিষেক করা দরকার। তুমি যদি এমনি করে কেঁদে কেঁদে নিজের ধৈর্য হারাও তাহলে কোনো কিছুই সু-সম্পন্ন হতে পারবে না। যে চলে গেছে তার বিয়োগ ব্যাথা বাড়িয়ে শুধু দুঃখ পাওয়া। তার স্মৃতিটুকু নিয়েই চলতে হবে তোমাকে। উপযুক্ত পুত্র তোমার দিবোদাস। ওর দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব কিছু ভুলে থাকতে হবে। নইলে ওর অমঙ্গল হবে। তুমি আর্যরমণী—এমনি করে মুষড়ে পড়া তোমার শোভা পায় না।

এই ভূমিতেই আমরা বছরের পর বছর সারা সপ্তসিন্ধুর আর্য-

জাতির মিলিত সমাবেশে বধ্র্যশের উদ্যমে অশ্ব-সমন দেখেছি। সমগ্র আর্যজনের মনে বধ্র্যশ্বের জন্য যে শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার তুলনা হয় না। প্রতিটি আর্য বধ্র্যশ্বের সফলতাকে নিজের সফলতা বলে মনে করত। যদিও হু'চার জন তার এতখানি প্রতিষ্ঠাকে ঈর্ষার চোখে দেখত কিন্তু তারা মুখ ফুটে কিছু বলবার ক্ষমতা রাখত না তাও আমি জানি। আর আজ এও জানি, তারাই অর্থাৎ কয়েকজন রাজা বধ্র্যশ্বের মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছে।

পরুষ্ণীর বাঁ দিকের ভূমিতে বিশাল চিতা প্রস্তুত হ'ল।

দিবোদাস এবং ভরত পরিবারের কয়েকজন প্রমুখ ব্যক্তি বধ্র্যশ্বের শব চিতার উপর তুলে দেয়।

মহাঋষি ভরদ্বাজ গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। দিবোদাস পিতার মুখে অগ্নিসংযোগ ক্রিয়া শেষ করে। মৃতকে উদ্দেশ্য করে ঋষি গুরুগম্ভীর স্বরে ঋচা পাঠ করলেন,—

"যে পথে আমাদের পূর্ব পিতামহেরা স্বর্গারোহণ করেছেন তুমিও সেই পথে তাঁদের কাছে গিয়ে অবস্থান কর। সেখানে তুমি যম এবং বরুণ উভয় রাজাকেই তোমার কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত দেখতে পাবে"।

হে যম! স্বর্গের পুণ্যাত্মাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তোমার যে চারচক্ষুওয়ালা পথরক্ষী রয়েছেন, হে রাজা! একে তুমি তাদের হাতে অর্পণ করো। একে সুস্থ এবং নিরোগ করো। একে তোমাকেই সমর্পন করলাম। ( ঋক্—১০।১৪।৭-১১ )

তারপর সমবেত কণ্ঠে সকলে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানায়,—

"হে ইন্দ্র! তোমার অনুগত ভক্তকে তোমার হাতে অর্পণ করলাম। তার দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে তার অপার্থিব জীবনকে সুস্থ ও সরল করো। তোমার কৃপাদৃষ্টি যেন থাকে তার উপর"।

পরুষ্ণীও আজ তাঁর প্রিয় বীর সন্তানের বিয়োগ ব্যাথায়

বেগে বইতে পারছে না। মা যেমন পুত্রের বিয়োগে ধীর, স্থির, গম্ভীর হয়ে অশ্রুপাত করে তেমনি পরুষ্ণীও আজ যেন স্থির হয়ে গেছে। তার উপর থেকে ধীরে ধীরে হাওয়া এসে চিতার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। যেন শেষবার মা তার পুত্রকে স্নেহ চুম্বন করছে।

দেখতে দেখতে চিতার লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মহাবীর ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্রযশ্বের নশ্বর দেহ ভস্ম হয়ে যায়।

কিন্তু তার যশগাথা আর্যজাতির মনের মধ্যে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল।

* * *

কয়েকদিন যাবত ভরত জনপদে ভয়ানক ব্যস্তভাব শুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। কে কোথায় কেমনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবে তাই নিয়ে ব্যস্ত।

দিবোদাসের অভিষেকের দিন আসন্নপ্রায়।

সমগ্র ভরতজনের মহা আনন্দের দিন। পৌরবীর জীবনেও সবচেয়ে দুঃখের পরই সবচেয়ে আনন্দের দিন। তার সন্তান ভরত জন-এর রাজা হতে চলেছে।

এতদিন পৌরবী ছিল রাজপত্নী। তখন দায়িত্ব ছিল রাজার উপর বেশি। আর আজ রাজমাতাই সবকিছু। নবতরুণ অনুভবশূন্য যুবরাজ যতদিন সম্পূর্ণ রাজ-দায়িত্বক্ষম হতে না পারবে ততদিন রাজমাতাকেই সব ঝামেলা সহ্য করতে হবে।

ঋষি ভরদ্বাজ হলেন ওদের পথপ্রদর্শক।

তাই তাঁর কর্মনিপুণতায় আজ আর কারো মনে এতটুকু খেদ নেই। ঋষি সমগ্র সপ্তসিন্ধুর আর্যদের সংবাদ পাঠালেন ভরত রাজের মৃত্যু এবং নতুন রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য।

আর্যদের নিমন্ত্রণ হয় মুখে মুখে। পণিদের কিন্তু এ বিষয়ে নিয়মটা আর্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা চামড়ার পট্টিতে লিখে নিমন্ত্রণ করে। আর্যরা এই নিয়ম মনে মনে ভাল স্বীকার করলেও যেহেতু এটা নিকৃষ্ট জাতি পণিদের নিয়ম, তাই তারা একে মেনে নিতে রাজী নয়। এমন অনেক নিয়ম রয়েছে পণিদের যা আর্যদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ কিন্তু আর্যরা বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে তা স্বীকার করে না।

নিমন্ত্রণের সংবাদ নিয়ে দ্রুতবেগে অশ্বারোহী ছুটল চারিদিকে। কেউ গেল সপ্তসিন্ধুর পশ্চিমে যে-সব আর্যজন অর্থাৎ পখত্ এবং গান্ধার দেশে, কেউ গেল পূর্বদিকে কুশিক দেশে।

এ সময়ে বশিষ্ঠ এবং কুশিক জন-এর প্রধান নেতা বিশ্বামিত্র বয়সে তরুণ হলেও তাঁরা নিমন্ত্রিত হলেন।

বসন্ত এখনো শেষ হয়নি। আবহাওয়া অনুকুল ছিল, তাই নিমন্ত্রিতদের অসুবিধার কারণ নেই। দেখতে দেখতে সমস্ত নিমন্ত্রিতরা এসে উপস্থিত হলেন।

আবার পরুষ্ণীর তীরের ঘন জঙ্গল বহুদূর পর্যন্ত মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে। এক এক জনপদের এক এক প্রধান-এর থাকবার জন্য অস্থায়ী বাসগৃহ। তাদের পশুদের থাকবার বেড়া এবং চরে বেড়াবার জায়গা। মানুষের ভীড়ের গন্ধ পেয়ে হিংস্র পশুরা ভয়ে পালিয়ে গেছে।

পৌরবী মুক্তহস্তে অতিথিদের সৎকারের ব্যবস্থা করেছে।

খুব সকালে দাসের মাথায় চাপিয়ে কলসী-কলসী সোম আর ক্ষীর প্রতি ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিত। তাছাড়া খাবার ব্যবস্থা হয়েছে অপর্যাপ্ত। যেন কোন সময় কারো মনে এতটুকু অভাব বোধ না হয়। তাছাড়া প্রতিদিন সায়ং-সন্ধ্যা অন্যান্য আর্য সরদারের সঙ্গে পান-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। উপস্থিত সকল নর-নারী পৌরবীর প্রশংসা করে শতমুখে।

অদ্ভুত জীব এই মনুষ্য জাতি।

মাত্র কয়েকদিন আগে যার বিয়োগ ব্যাথায় প্রতিটি মানুষ চোখের জল ফেলছিল, সেই জল শুকোবার আগেই তারাই চারিদিকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আনন্দ-মঙ্গল উৎসব করছে।

কিন্তু আগত অতিথিদের মধ্যে এমন কেউ কেউ রয়েছেন যারা মনে মনে খুশী নয়।

তেমনি পুরুকুৎস এখানে যদিও এসেছেন কিন্তু মনে যেন তার শান্তি নেই। যদিও তার আপন ভাগ্নের অভিষেক উৎসব, তবুও বধ্রযশ্বের দেশজোড়া খ্যাতির জন্য মনে মনে পুরুকুৎসের হিংসা হ'ত।

পুরুকুৎস যদিও পুরুজন-এর রাজা ছিল তবুও পুরুজাতির সকল শাখাজাতিগুলি তার অধীন নয়। পুরুকুৎস সমগ্র আর্যজন-এর মধ্যে নিজেকে জন্মজাত প্রধান বলে মনে করত। কিন্তু বধ্রযশ্ব যদি নিজের গুণে ও নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে থাকে তাহলে তার কি দোষ?

কুৎস তার ভগ্নিপতীর কাছে অধীনের মত বিনম্রতা দেখাত বটে কিন্তু অন্তর দিয়ে নয়। দিবোদাসও মামাকে পিতার চেয়ে কম শ্রদ্ধা বা সম্মান করত না।

এমনি ভাবে যদু এবং তুর্বশ কুলের সকলে এসেছেন শিষ্টাচার বজায় রাখতে। পুরুদের সঙ্গে এদের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল। পরে যখন ভরত সকলের প্রিয় হয়ে উঠল তখন এদের চমক ভাঙ্গল।

বধ্রযশ্বের প্রতি অসন্তোষ কেবল মাত্র কয়েকজন সামন্ত বা রাজার মনের মধ্যেই দেখা যেত। তাছাড়া সমগ্র প্রজাসাধারণের মধ্যে কখনো তেমন ভাব দেখা যায়নি।

ত্রসদস্যু কিন্তু পিতার অনুকরণ করত না। বরং তার পিশতুতভাই দিবোদাসের সাথে ঠিক যমজ ভাইয়ের মতই ব্যবহার করত।

দেখতে দেখতে কয়েকদিন কেটে গেল প্রস্তুতি শেষ করতে।

অবশেষে অভিষেকের দিন এল। সেদিন সকাল থেকে কর্মকর্তাদের ব্যস্ততার অন্ত নেই। প্রাতঃকর্ম শেষ হবার পর বিধিমত আচার অনুষ্ঠানও শেষ হ'ল।

রাজবাড়ীর আঙিনায় বিরাট কাঠের মঞ্চ। তার উপর সারি সারি. তামার কলসীতে জল ভর্তি। আর্যজন সাতসিন্ধু থেকে জল এনেছে। এই জলে স্নান করে অভিষেক হবে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র ও সূর্যবন্দনার শেষে আনুষ্ঠানিক ভাবে দিবোদাসকে মঞ্চের উপর আনা হয়। তারপর'এক এক করে আর্য সামন্ত ও প্রজারা দিবোদাসের মাথায় সপ্তসিন্ধুর জল দিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ঋষি ভরদ্বাজ মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

স্নানপর্ব শেষ করে দিবোদাসকে নতুন অন্তর্বাসক, দ্রাপি আর উষ্ণীষ পরিয়ে রাজ পোষাকে সাজিয়ে আনা হ'ল। আঙিনায় সুন্দর চন্দ্রাতপের নিচেয় সমগ্র আর্যপ্রমুখ উপবিষ্ট। তার মধ্যে তাজা বৃষভ চর্মের উপর দিবোদাসকে এনে বসানো হয়। ঋষি ভরদ্বাজ উঠে এসে দিবোদাসের হাতে পলাশের ডাল দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

"আমি তোমাকে আজ এই মঞ্চের উপর এনেছি। তুমি দেশের শ্রেষ্ঠ-মান্যব্যক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত হলে। তুমি অচল এবং ধ্রুব হয়ে থাকো। তোমার রাষ্ট্র কখনো ভ্রষ্ট হবে না ॥ ১ ॥

"তুমি এখানে পর্বতের মত অচল অটল হয়ে থাকো। কখনো নিজের কর্তব্য থেকে চ্যুৎ হয়োনা। ইন্দ্রের মত ধ্রুব হয়ে থাকো এবং রাষ্ট্রের ন্যায়দণ্ড ধারণ করো ॥ ২ ॥

"দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং ধ্রুবের আকারে এই ধ্রুবলতা সৃষ্টি করেছেন। তার রসপানে সোমদেব পরিতুষ্ট হন; তেমনি তোমার গুণে সমগ্র দেশ, ব্রাহ্মণস্পতি তুষ্টহৌক ॥ ৩ ॥

"কর্ম ধ্রুব, পর্বত ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুবা। এই সমগ্র জগত ধ্রুব, তেমনি প্রজাদের এই রাজা ধ্রুব হউক ॥ ৪ ॥

"তোমাদের রাজা বৃহস্পতি ধ্রুব, বরুণ ধ্রুব, ইন্দ্র এবং অগ্নি ধ্রুব। তাঁরা তোমার রাষ্ট্রের কল্যাণ-ভার গ্রহণ করুণ ॥ ৫ ॥

ধ্রুব-হবি দ্বারা আমরা মিশ্রিত করছি। ইন্দ্র তোমার প্রজাদের সবল, সুস্থ, একতা-পরায়ণ এবং করদাতা করুন ॥ ৬ ॥

( ঋক্ ১০।১৭৩ )

এরপর দিবোদাস তার প্রজাদের সামনে শপথ গ্রহণ-করে। প্রজাই রাজার সৃষ্টি করে। প্রজাদের সহায়তায় রাজা অচল থাকে।

শপথ গ্রহণ শেষ হলে সকলে নবীন রাজা দিবোদাসকে শুভকামনা জানতে আসে। সর্বপ্রথম পুরুকুৎস শুভকামনা জানিয়ে আশীর্বাদ করে। আশীর্বাদ করবার সময়ে পুরুকুৎস সর্বান্তকরণে ভাগিনেয়কে আশীর্বাদ করে মঙ্গল কামনা করে বলে,—আমি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করে দিবোদাসের যোগ্যতার প্রশংসা করছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর পিতা যে যজ্ঞ উদযাপন করে গেছেন দিবোদাস তা সম্পন্ন করবে। হয়ত সে সব দেখবার জন্য সেদিন আমি বেঁচে থাকব না, কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের কথা—আমার পুত্র ত্রসদস্যু এবং দিবোদাস দুজনের মধ্যে সহোদর ভাইয়ের চেয়েও অধিক প্রেম ও ভালবাসা রয়েছে।

তারপর বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র এবং পৌরব জনের অন্যান্য মুখ্যব্যক্তিরা একে একে এসে দিবোদাসকে তাঁদের আন্তরিক শুভকামনা প্রকাশ করেন। তার পর অন্যান্য আর্যজনাধিপতিরা আসেন। সবশেষে প্রজাবৃন্দ তাদের নতুন রাজার আনুগত্য স্বীকার করে মঙ্গল কামনা করে।

যদু এবং তুর্বশ নেতাদের কয়েকটি কথায় কিছু লোক অসন্তুষ্ট হয়। রাজা বধ্রযশ্বের বীরত্বের ও গুণের কথা বলতে গিয়ে তারা

বলেন,—বধ্রযশ্ব মাঝে মাঝে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, আমরা আশা করি পুত্র তার পিতার চেয়ে অধিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেবে এবং সৌজন্যতার পরিচয় দেবে।

দিবোদাস তার সকল আর্য বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যদু এবং তুর্বশদের উদ্দেশে অত্যন্ত নম্রভাবে সম্মান প্রদর্শন করে বলে—

—যদু এবং তুর্বশ চিরকাল সপ্তসিন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ বীরসন্তানদের জন্ম দিয়েছে। দস্যুদের দমন করতে তাদের হাত সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, অন্য আর্য-জন যদি প্রতাপী রাজার জন্ম দিয়ে থাকেন, সেই অনুপাতে যদু ও তুর্বশ জন-এর প্রতিটি সন্তানকে মহাবীর ও সুশিক্ষিত করে তৈরী করা হয়েছে। সমগ্র আর্যজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন তারা—তাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। মহান ইন্দ্রের কাছে আমি প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে আপনাদের বিশ্বাস ও বাৎসল্য অর্জন করবার উপযুক্ত যোগ্যতা দেন। আমি বিশ্বাস করি আমার গুরু আমাকে পথভ্রষ্ট হতে দেবেন না।

অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হল।

সেদিন সন্ধ্যায় ইন্দ্রের জন্য বিশেষ হোম যজ্ঞের আয়োজন হয়। যজ্ঞশেষে বহুপ্রকার সুস্বাদু সোম ও মাংস দ্বারা অভ্যাগত অতিথিদের পরিতুষ্ট করে খাওয়ানো হয়। অনেক রাত অবধি চলল পান ভোজন উৎসব।

যা কিছু শুরু হয় তার শেষ হবেই।

তেমনি সেদিনকার সেই আনন্দেরও শেষ হয়। তারপর যে যার ঘরমুখে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে।

আনন্দের শেষে সকলের বিয়োগ চিন্তায় মন বিষাদময় হয়ে ওঠে।

তবুও সকলকে যেতেই হবে। দুই তিন দিনের মধ্যে সকল অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে যায়। পরুষ্ণীর তীরের জঙ্গল আবার নির্জীব হয়ে পড়ে।

সকলে চলে যাবার পর দাস-দাসীরা আর দরিদ্র পণিরা অতিথিদের বাসস্থানগুলি খুঁজে দেখে। যদি কারো ফেলে যাওয়া তামার বাসন, তীরের ফলা, ছুরি বা কাঠের চষক পড়ে থাকে তাহলে সেই অতিথিকে প্রশংসা করে তার উদারতার জন্য।

কিষানদের জমির জন্য বেশ কিছু সার পাওয়া গেল। পরিত্যক্ত গৃহগুলিকে ভেঙ্গে চুরে তারা নিয়ে যায়। জোর করে তাদের যে খাটানো হয়েছিল, এই হ'ল তার পারিশ্রমিক।

ঋষি ভরদ্বাজ ছিলেন দিবোদাসের প্রধান পরামর্শদাতা। তাছাড়া মা পৌরবী ত রয়েছেই। রাজা দিবোদাস বয়সে তরুণ হলেও রাজার দায়িত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে ভীষণ সচেতন ছিল। কোনো কাজই বিনা বিচারে বা পরামর্শ না করে করত না। ওর মত তরুণ বয়সে এতখানি নম্রতা দৈবাত দু'একটা দেখা যায়।

ভরদ্বাজ ঋষি দিবোদাসকে সাধারণ শিষ্য বলে কখনো ভাবেননি। তিনি দিবোদাসের উপর বহু কিছু আশা করতেন। ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্নকে সাকার রূপ দেবার উপযুক্ত পাত্র বলে ভাবতেন দিবোদাসকে।

একবার হিমালয়ের পাদদেশে একটা পণিগ্রাম কিলাত দস্যুরা এসে লুটপাট করে নিয়ে যায়। অনেক মানুষকে তারা হত্যাও করেছিল। দিবোদাস ও তার বন্ধুরা মিলে কিছুদিন আগে এই গ্রামেই এসেছিল সিংহ শিকার করতে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে ভরদ্বাজ বললেন,—আমাদের শত্রু পণিদের মধ্যে আর যুদ্ধ করবার মত দম নেই। তাছাড়া ওদের সাহস ও শক্তি ওরা হারিয়ে ফেলেছে। শত্রু বলতে নিষাদদেরও বোঝায় বটে কিন্তু সিন্ধুভূমিতে

তাদের সংখ্যা খুব অল্পই রয়েছে। বর্তমানে আমাদের বাস্তবিক শত্রু হ'ল ওই পাহাড়ী কিলাত ( কিরাত ) জাতি।

—কিন্তু শস্ত্র বা বুদ্ধির শক্তিতে কিলাতরা ত কিছুই নয়। তবে ওদের ভয়ের কি আছে ?

—শস্ত্র বা বুদ্ধিবলে যদিও ওরা আমাদের কাছে তুচ্ছ, তবুও ওরা যথেষ্ট শক্তি ধরে। ওদের মত নির্ভীক এবং সঙ্ঘবদ্ধ জাতি বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই। সেই শক্তিই ওদের সবচেয়ে বড় শক্তি। তবে শোন একটা ঘটনা—

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগেকার কথা, তখন তুমি জন্মাওনি। সেবার শলভো ( পঙ্গপাল )-দের আক্রমণ হল দেশে। বন্যার স্রোতের মত তারা এসে বন জঙ্গল, গ্রাম, খেত খামার ছেয়ে ফেলতে লাগল। লোকে মনে করল এবার দেশে আর কোনো প্রাণী থাকা ত দূরের কথা প্রকৃতির সবুজ রংকেও এরা নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

—সে কি ? সামান্য পতঙ্গের এত শক্তি ?

—হ্যাঁ। আমি বিপাশের কিনারে নিজের দলের লোকের সঙ্গে বাস করতাম। আমার সঙ্গে যে সব তরুণ ছিল তাদের মধ্যে উৎসাহ বা সাহসের অভাব ছিল না। বরং এক একজনকে মহাবীর বলা যেতে পারে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর খেতের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখছি। সেবার ফসলের বৃদ্ধি বা ফলন দেখে আমাদের অসীম আনন্দ। আমাদের কেন, সে ফসল দেখলে দেবতাদেরও আনন্দের সীমা থাকে না। আমরা ভাবছি এবার রোজ আমরা যবাশির অর্থাৎ যব ও ক্ষীর দিয়ে তৈরী পিঠে খাব। এই সব কথা বলতে বলতে ক্ষেতের আল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমন সময় পশ্চিম দিকে যেন একটা ঘড় ঘড় শব্দ শুনতে পেলাম।

পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি লম্বা লম্বা পতঙ্গ কিছু এলো-মেলো উড়ছে। আর একটু দূরে তাকিয়ে দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে

উড়ছে কিন্তু দিগন্তের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভয়ে আমাদের বুক শুকিয়ে গেল।

হাজার, লক্ষ, কোটির সংখ্যা দিয়ে তাদের তুলনা করা যায় না। মুহূর্ত মধ্যে দিনের বেলায় যেন সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল। সূর্যদেব ঢাকা পড়লেন পতঙ্গের ঝাঁকের আড়ালে। ঠিক যেন সমুদ্রে বান ডেকেছে। তেমনি ঢেউয়ের পর ঢেউ, কাতারে কাতারে স্রোতের বেগে এগিয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে আমাদের খেতের দিকে তাকিয়ে দেখি এক একটা যবগাছে একশ্-দেড়শ্ পতঙ্গ বসে দিব্যি খেতে শুরু করেছে। খাবার সময়কার সে বিকট শব্দ কানে যেতে গায়ে কাঁটা দেয়।

আমাদের গায়েও উড়ে উড়ে পড়ছে এবং দু-একটা কামড়ে দিচ্ছে।

গতিক খারাপ দেখে আমরা প্রাণ নিয়ে বাড়ীর দিকে পালালাম। পতঙ্গের ঝাঁক সামনে যা পাচ্ছে তাকে ছেয়ে ফেলছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আর অস্তিত্ব থাকছে না।

বাড়ীতে গিয়ে দেখি উঠোনে প্রায় আধ হাত মোটা চাদরের মত বিছিয়ে রয়েছে। কোনো প্রকারে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম, নইলে ঘরের মধ্যেও এসে ঢুকত ওরা। তাহলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াত বলা কঠিন।

বাড়ীর চালগুলি ত আগে থেকেই ভর্তি হয়ে ছিল। আমরা প্রথমে সামান্য পতঙ্গকে অতখানি প্রাধান্য দিইনি, কিন্তু খড়ের চালগুলি কিছুক্ষণের মধ্যে যখন ওদের ভারে ভেঙ্গে পড়তে লাগল তখন আমরা প্রাণের মায়া একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলাম।

অন্ধকার হতে পতঙ্গের ঝাঁক কোথাও বিশ্রাম করবার জন্য জমা হয়। ওদের বিশ্রাম মানে মুখ বন্ধ করে রাখা। আবার দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওদের অভিযান শুরু হয়।

ওদের খিদের পরিতৃপ্তি হয় না কখনো। এমনই জাত ওরা।

প্রথমদিনের বন্যায় সামান্য কিছু শষ্য বা সবুজ পাতা যা বেঁচে গিয়েছিল পরদিন তা একেবারে শেষ হয়ে গেল। বিকেল হতে হতে কোথাও আর সবুজের নাম-গন্ধ রইল না।

তৃতীয় দিনে পতঙ্গের দল ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। গাছ-পালা আর কিছু না পেয়ে এবার রক্তের নেশায় মেতে উঠল। সামনে যে কোনো প্রাণীকে পেল তাকেই আক্রমণ করল। আমরা নিজের চোখে খেতে দেখিনি, কারণ তখন সাহস করে দরজা খুলিনি কয়েকদিন। পরে দেখেছি ঘরের বাইরে যে কোনো জীবকে পেয়েছে ওরা তার শুধু হাড়টুকু বাকী রেখে গেছে।

অগত্যা আমরা অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হলাম।

কাঠ-কুটো, খড়-বিচালি যেখানে যা পেলাম আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। ভাবলাম আগুনের সামনে পরাজয় স্বীকার করে না এমন বস্তু পৃথিবীতে বোধ হয় কিছু সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তখন দেখেছিলাম নির্ভীকতাপূর্বক সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি কত ভয়ানক হতে পারে।

আগুনের লেলিহান শিখাও ওদের ভীত করতে পারল না। ওরা আগুন দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে সেই দিকে আসতে লাগল। এক সঙ্গে যেন একখানা বাদলামেঘ এসে এক একটা আগুনের কুণ্ডলীকে চাপা দিতে লাগল।

অসংখ্য শলভো-এর সামনে অগ্নিদেবকেও পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল।

আগুনকে ঢেকে দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিল পতঙ্গের ঝাঁক। ওদের ঝলসানো শরীর গলে এমন জল বের হতে লাগল যে আগুন নিভে গিয়েও সেই জল গড়িয়ে যেতে থাকল।

—কি আশ্চর্য।

—শুধু আশ্চর্য নয় অবিশ্বাস্যও বটে। যে নিজের চোখে দেখেনি

সে কখনোই বিশ্বাস করবে না। রাস্তায় যে কত লোক মরেছিল তা আন্দাজ করা কঠিন। যাই হোক, সব কিছু বাদ দিলেও তারা মহাপ্রলয়ের যে-চিহ্ন রেখে গিয়েছিল তা দেখে বহুলোক আতঙ্কে মারা গেছে।

আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কাপুরুষের মত ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে যে যার প্রাণ রক্ষা করেছে।

তবে সৌভাগ্যের কথা সমগ্র সপ্তসিন্ধুতে এই প্রলয়লীলা সংঘটিত হয়নি। ভরত, পুরু প্রভৃতি দুই তিনটা জনপদের উপর দিয়েই গেছে।

তখন সকলে বিশ্বাস করল ইন্দ্রের কোপ কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে। আর ইন্দ্রের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সামন্য পতঙ্গ কেমন মহাপ্রলয় সাধন করতে পারে।

তখন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে শত্রুদের মধ্যে শলভো এর মত প্রকৃতি থাকলে যুদ্ধের সময় তারা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে।

কিলাতদের ঐ শলভোদের মত প্রকৃতি রয়েছে, তাই নিরস্ত্র হলেও ওরা ভয়ঙ্কর, ভীষণ।

ভরদ্বাজের কথায় সকলে আশ্চর্য না হয়ে পারে না। সকলেই মনে মনে শত্রুদের সম্বন্ধে একটা সংকল্প গ্রহণ করে।

বধ্রযশ্ব সমগ্র আর্যশক্তিকে একতাবদ্ধ করবার জন্য যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় সে কাজে অনেকখানি সফলতা মিলেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সে কাজে ভাটা পড়ল। আবার সপ্তসিন্ধুর জায়গায় জায়গায় বিভেদের চাপা আগুন দেখা যেতে লাগল।

কিন্তু সৌভাগের কথা রাজা দিবোদাস ভরদ্বাজ ঋষির মত সহায়ক এবং পথ প্রদর্শক পেয়েছিল।

## ॥ ছয় ॥

"অক্ষৈর্মা দিব্যঃ কৃষিমিত কৃষস্ব"

[ ঋঃ পূঃ ১১৯৫ ]

দিবোদাস রাজা হয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। নিজের জন-কে সর্বপ্রকারে সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

নিজের পরিবারের জন্য কোনো চিন্তা ছিল না। পিতার অর্জিত পশু এবং ধন ওর পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

দিবোদাসের চরিত্রে তার স্বাভাবিক রুচি বা গুরু ভরদ্বাজের শিক্ষার জন্য কোনো বিলাশ ব্যসন ছিল না। সরল এবং পরিশ্রমী জীবনকে খুব ভালবাসত দিবোদাস। সমগ্র জন যতদিন কষ্ট থেকে মুক্ত হতে না পারছে ততক্ষণ শান্তির নিশ্বাস কেমন করে সে ফেলবে।

বিপাশ, শতদ্রু ও পরুষ্ণীর মধ্যস্থিত নিজের জন্মভূমির মধ্যে নিজের পশু নিয়েই ব্যস্ত থাকত না দিবোদাস। সর্বদা এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে ঘুরে ঘুরে নিজে প্রজাসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের সুযোগ সুবিধার দিকে নজর রাখত।

সেবার এমনি ঘুরতে ঘুরতে রাজা দিবোদাসের অস্থায়ী-গ্রাম তৈরী হ'ল পরুষ্ণী বা রাবীর উত্তর দিকের কিনারে।

রাজার কর্তব্য সকলের পারস্পরিক বিবাদ দূর করা।

সেদিন প্রাতঃকালীন ক্রিয়া-কর্ম শেষ করে এসে বসতে একজন লোক আর একজনকে ধরে রাজার সামনে হাজির করে বলল—

—এই লোকটা আমার কাছ থেকে ঋণ করেছিল কিন্তু ঋণ এখন শোধ দিতে চায় না। এর বিচার করুন।

রাজা প্রতিবাদীর দিকে তাকাতে সে আর্তস্বরে বলল, আমি সত্যিই ঋণ করেছি। কিন্তু ঋণ শোধ করবার মত আমার কাছে কিছুই নেই। বাদী প্রতিবাদ করে বলে,

—ওর মাতা-পিতা, শ্বশুর শ্বাশুড়ী সকলে আছে। তাদের কাছে প্রচুর ধন রয়েছে। ও ইচ্ছা করলে সেখান থেকে নিয়ে আমাকে দিতে পারে।

—হ্যাঁ ধর্মাবতার, আমার সকলেই ছিল কিন্তু বর্তমানে কেউ নেই। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আমাকে ঈর্ষা করেন। আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন কেউই নেই আমাকে একটি তাম্রখণ্ড দেবার মত, একমুঠো অন্ন-দেবার মত। মূল্যবান বৃদ্ধ ঘোড়ার মতই আমার বর্তমান অবস্থা।

ইতিমধ্যে দরবারে অনেক লোক জমা হয়েছে। প্রতিবাদীর পিতা-মাতা সকলেই এসেছে। বাদী তাদের দেখিয়ে বলল,

—ঐ দেখুন, ওর পিতা মাতার বেশ-ভূষা দেখে বেশ বোঝা যায় ওরা দরিদ্র নয়।

অতঃপর প্রতিবাদীর পিতা এগিয়ে এসে রাজার সামনে নিবেদন করে,

—বাদী সত্যি কথা বলেছে। আমরাই বলেছিলাম যে ওকে বেঁধে যেখানে খুশী নিয়ে যাও। জুয়াড়ীর কাছে কেউই আপনার হয় না। অতএব আমরা ওকে চিনি না বলেছিলাম।

এবার দিবোদাস আসল রহস্য বুঝতে পারে। বস্তুতঃ লোকটি ঋণ করেনি। জুয়াতে হেরে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। দিবোদাস প্রশ্ন করে—

—এর স্ত্রী কোথায়? যুবকের মা ভীড়ের ভিতর থেকে উত্তর দেয়,

—ওর কাছেই জিজ্ঞাসা করুন আমার স্নুষা (পুত্রবধু) কোথায়।

—আমার স্ত্রী সত্যি অনুরাগিনী ছিল। কখনো আমার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করেনি। আমার এবং আমার মিত্রদের জন্য সে

কল্যাণীরূপিনী ছিল। শুধু আমার জুয়া খেলার জন্য সে আমার উপর বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। বলল জুয়াড়ী যুবক।

—আর আজ সে বাধ্য হয়ে অন্যের কাছে চলে গিয়েছে। কতদিন আর কষ্ট সহ্য করবে! ঐ শয়তান তাকেও বাজী রাখতে চেয়েছিল। বলল একজন দর্শক। সেদিন বাড়ী থেকে যাবার সময় বুক ফুলিয়ে বলেছিল, আজ অবশ্যই জিতে আসব। এলো হেরে, ঋণের বোঝা মাথায় চাপিয়ে। সর্বস্ব হারিয়ে। আরো একদিন একঘরে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। সেই লোকটা ওর পিতা-মাতার সম্মানের কথা ভেবে ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। এবার জুয়াড়ীর পিতা বলতে আরম্ভ করে,—

—গত কয়েকদিন যাবত কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। রাতের বেলাতেও বাড়ী আসত না।

এবার জুয়াড়ী নিজের দোষ-স্বীকার করে বলল,—এ সবই সত্য। আমি এও জানি, জুয়া খেলা অপরাধ। কয়েকবার প্রতিজ্ঞা করেছি আর খেলব না। কিন্তু পাশার ঘুঁটি দেখলেই আমার যেন কী হয়ে যায়। সব কিছু ভুলে গিয়ে খেলতে বসে যাই। জুয়াড়ী বন্ধুদের সংসর্গ ত্যাগ করতে ভয় পাই। হিমালয়ের সোম যেমন মানুষকে উত্তেজিত করে তেমনি কাঠের ঘুঁটিগুলো চোখে পড়তেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মত জুয়ার আড্ডায় গিয়ে হাজির হই।

কথা শেষ করে জুয়াড়া মাথা নিচু করে।

দিবোদাস ভাবছিল, এই রোগ কেবল এই পুরুষটির মধ্যে নয়, আর্যজাতির মধ্যে ধীরে ধীরে বেশ প্রসারলাভ করছে। শ্রম না করে ধন উপার্জনের লিপ্সা তাদের ক্রমশ নিচের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

জুয়াখেলে কেউই ধনী হয় না। আজ যদি জিতে আসে ত কাল

যথাসর্বস্ব হেরে বসে থাকে। তবে এখনো সুরার নেশা আর্যদের মধ্যে ঢুকতে পারেনি, তাই কতকটা নিশ্চিন্তের কথা। সুরা অনার্যদের পানীয়। আর্যদের মধ্যে সোমই চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। সোম পান করলে নেশা হয় বটে কিন্তু মর্যাদার অতিক্রমণ হতে দেয় না।

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে জুয়াড়ীকে বলল দিবোদাস—

—তুমি আর পাশা খেলবে না। খেত-খামার করো। নিজের গরু, ভেড়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। সবিতা স্বামীর এই আদেশ।

তারপর উপস্থিত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলে,—আপনারা সকলেই জানেন জুয়া খেলা পাপ। জুয়াতে পশু, দাস-দাসী, স্ত্রী বাজী রাখা সত্য-ধর্মের বিরুদ্ধ। প্রত্যেকের কর্তব্য এই পাপকাজ থেকে দূরে থাকা। এ বিষয়ে আমি এখুনিই কোনো পাকা ব্যবস্থা করছি না। আজ-কালের মধ্যেই আমি সকল ঋষি, সর্দার বা সকল জন-এর বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করব। যদি তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হন তাহলে জুয়া খেলাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে আইন করা হবে।

দিবোদাস সেদিন নিজের জাতির মধ্যে এক বিরাট দুর্বলতার সন্ধান পেল। কয়েকদিনের মধ্যেই অন্যান্য জন-বৃদ্ধদের কাছ থেকে মতামত চাইলে তারা সকলেই দিবোদাসের সঙ্গে সহমত হল।

ঋষি ভরদ্বাজও দিবোদাসের পক্ষে তাঁর মত প্রকাশ করে বললেন,—আর্যদের মধ্যে যথেষ্ট সময় আছে বলেই তারা বিনা পরিশ্রমে ধনার্জনের সুযোগ পায়। পণিদের মধ্যে এই ব্যসন সবচেয়ে অধিক প্রচলিত। এরা নিজেদের মধ্যে খেলবার অবসর না পেলে পণিদের মধ্যে গিয়ে খেলবে।

—তবে সেখানে তারা সঙ্গে যতটা ধন নিয়ে যাবে ততটাই হারতে পারবে। তার বেশি বাজী রাখতে পারবে না।

—তার চেয়ে এদের ধনার্জনের কাজে লাগিয়ে দিলে এই সুযোগটা তারা কম পাবে বলে আমার মনে হয়। তাছাড়া ক্রমশ অর্থের লোভও কমে আসবে।

—ধনার্জনের কাজে বরাবর লেগে থাকলে মানুষের মনে শ্রান্তি নেমে আসে। তখন সে ক্রীড়া বা বিনোদ খোঁজ করবেই। বললেন ভরদ্বাজ। কৃষি বা পশুপালন ধনার্জনেরই ত কাজ।

—তবুও জুয়া নিষিদ্ধ করলে ধনের হানির পরিমাণ অনেক কমে যাবে। তাতে খানিকটা লাভ নিশ্চয় হবে। বলে দিবোদাস।

—খানিকটা কেন, অনেকটা লাভ হবেই। পশু-প্রাণীদের ত জুয়ায় হারতে পারবে না। তাছাড়া ঋণ নিয়ে খেলবার সুযোগ পাবে না। কিন্তু এই বদ অভ্যাস দূর করতে হলে আমাদের অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। লোকের মনোরঞ্জনের জন্য অধিক সময় ও উপায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

—সেটা কেমন করে হবে ?

—এ বিষয়ে আমি বহুদিন থেকে ভাবছি। আমাদের পূর্ব ঋষিরা এই জন্যেই মেলা, প্রতিযোগিতা, নৃত্য, সামগান প্রভৃতি নানাপ্রকার বিনোদের নিয়ম করেছিলেন। তবে সে সবের জন্য অবসর বা আয়োজন খুবই কম। আয়োজন যা হয় তাও তেমন আকর্ষক হয় না। তাই গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় এ সবের প্রচার দরকার।

তাছাড়া প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাও করা দরকার। তোমার পিতা কেমন সমস্ত সপ্তসিন্ধুর জন্য অশ্ব সমন-এর ব্যবস্থা করেছিলেন দেখনি ? দেখনি অশ্বসমনে সারা সপ্তসিন্ধুর লোক কেমন উদ্যোগী হয়ে ছুটে আসে। কেমন আকৃষ্ট হয়েছে ঐ একটা উৎসবে ? তেমনি এখানে প্রতি গ্রামে গ্রামে এমনি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী, শ্রেষ্ঠ সাম গায়ক, নর্তক-নর্তকীদের উৎসাহিত করে ছোট ছোট দলীয় প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে বড় বড় প্রতিযোগিতায় তাদের অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দিতে হবে।

শুধু তাই নয় কৃষিকাজে চতুরতা, পশুপালনের শ্রেষ্ঠতা ; কাঠ, পাথর, মাটি, তামা প্রভৃতি শিল্পের প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। সেই তামা দিয়ে একই কাজ হবে যেমন হচ্ছিল, কিন্তু প্রতিযোগিতার জন্য কুশল হাতে কত সুন্দর সুন্দর বাসন, ফলক, কলসী অথবা পাথরের নানাপ্রকার জিনিষপত্র তৈরী হবে।

এই কাঠের কারিগরের হাতে এখনকার চেয়ে অনেক সুন্দর উলুখল ( কাঠের তৈরী এক প্রকার খল, যাতে ধান ছাড়ান হয় ), তারোতল ( চর্মবেষ্টিত পেয়ালা ), কুচক ( সিন্দুক ), তিতউ ( চালনী এবং ছাতা), ময়ূখ ( খুঁটি ), শঙ্কু ( খিল-খুঁটি-সূর্যচ্ছায়া মাপবার দ্বাদশ আঙ্গুল মাপকাঠি ) প্রভৃতি তৈরী হবে।

তারপর মাটির তৈরী 'আসেচন' ( ঘড়ার আকারের একপ্রকার মাটির বাসন বা গামলা ), উন্দচন, উপসেচনী, কলস, কাণ্ডুপ, কুম্ভ, দ্রোণ, বৃথা প্রভৃতি তৈরী হবে। তার মধ্যে সেই সকল হাতেই কত সুন্দর কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমাদের খাবারের মধ্যে ক্ষীর, ঘি, যব, মাংস, চর্বী প্রভৃতি। কিন্তু সকল হাতেই সুন্দর সুস্বাদু খাবার তৈরী হয় না। সব হাতেই আশীর ( দুধ ও সোমমিশ্রিত ক্ষীর ), গবাশীর, যবাশীর, পৃষদাস্য ( ঘৃত মিশ্রিত দই ), পুরোডাশ তৈরী হয় না। কুশল সুপকার সাধারণ মাংসের এমন চমৎকার যুস তৈরী করে যে একবার খেলে তা আর ভোলা যায় না।

আমাদের সকল কাজে, সকল সামগ্রীতে নতুন কৌশল, নতুন সৌন্দর্য উৎপন্ন করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। এইদিকে তাদের যদি প্রোৎসাহিত করা যায় তাহলে তাদের কাছে মনের খেয়াল

মেটাবার সুযোগের অভাব হবে না। এর কারণ তাদের মন ও বুদ্ধিকে কাজে লাগাবার প্রকৃত সুযোগ পাবে এবং তাদের শরীরও অধিক কর্মঠ হবার সুযোগ পাবে। তাহলে তারা ইন্দ্রের কৃপাপাত্র হতে পারবে।

—ইন্দ্রকে আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না। বলল দিবোদাস।

—ইন্দ্রকে ভুলে যাওয়ার অন্য অর্থ হ'ল ঘোর পরাজয়। ইন্দ্র আমাদের গরু, ঘোড়া, মেষ, নর-নারীর সর্বদা কল্যাণ করেন। তাঁকে যদি আমরা ভুলে যাই ত তিনিও আমাদের অকল্যাণ করবেন।

ইন্দ্রের কৃপায় এবং নিজের চেষ্টায় মানুষ কি না করতে পারে। বেচারী বিস্পলাকে জানো ত? সেই অগস্তের পত্নী। একবার তার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। একজন কুশল কারিকর তাঁকে কাঠের তৈরী তামা দিয়ে বাঁধিয়ে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত পা তৈরী করে দিয়েছিল। স্বয়ং ইন্দ্র সেই কারিকরকে সহায়তা করে তার কৃত্রিম সৃষ্টিকে সফল করেছিলেন। তাই বলছি, যে কর্মপরায়ণ হয়, দেব-দেবীরা তার সহায়তা করেন।

—ঠিক বলেছেন। আর্য শিল্পীদের প্রোৎসাহিত করা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার।

—তাছাড়া পণিদের কথা ভেবে দেখ। তারা নিজেরা সুতোর তৈরী কঞ্চুক পরে তাও অন্য ধরণের। দামী দামী দ্রাপী বা কঞ্চুক শুধু আমাদের জন্যেই তৈরী করে। এক একটা কঞ্চুকের বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে একটা বা দুটো সুন্দর ঘোড়া নিয়ে যায়। আমরা যদি সে কাজ শিখি তাহলে ক্ষতি কি?

ঋষি ভরদ্বাজকে সঙ্গে নিয়ে দিবোদাস, ভুজ্যু, কুৎস এবং অন্যান্য ভরত প্রমুখরা আরো উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। উত্তরদিকে

কিলাতরা মাঝে মাঝে উপদ্রব করছিল। এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ছিল কিলাতদের উপদ্রবের একটা কিছু ব্যবস্থা করা।

সেদিন সায়ংকালে ওরা এক আর্যগ্রামে এসে পৌঁছায়। সমগ্র গ্রামবাসী তাদের রাজা ও তাদের রাজগুরুকে ভীষণ উৎসাহভরে স্বাগত জানায়। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভীড় করে ছুটে আসে তাদের নবীন রাজাকে দর্শন করতে।

গ্রাম্য মুখ্যের বিরাট অতিথিশালায় সকলের বসবার ব্যবস্থা করে সঙ্গে সঙ্গে পান ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। সকলে বিশ্রাম করবার জন্য বসেছে ইতিমধ্যে কে যেন ভুজ্যুর কানে কানে এসে বলল,—এর আগেও আমরা গন্ধর্ব গৃহীতা কুমারীর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি, কিন্তু এখানে একজন গন্ধর্ব গৃহীতা রয়েছে তার সম্বন্ধে নানারকম আশ্চর্য কথা শুনছি। সে নাকি কখনো আর্যভাষায় আবার কখনো পণিভাষায় কথা বলে। আবার কখনো চোখে না দেখা জিনিষের সম্বন্ধে অনেক সব কথা বলছে।

—তাহলে তার কাছ থেকে ত কিলাতদের সম্বন্ধে অনেক খবরা-খবর শোনা যাবে। চলো দেখি। বলল দিবোদাস।

কয়েকজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে দিবোদাস তখুনিই গ্রামের অন্য প্রান্তে রওয়ানা হয়। যে বাড়ীতে গন্ধর্ব গৃহীতা কুমারী ছিল সেখানে যথেষ্ট ভীড় ছিল। স্ত্রীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা অধিক।

সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু এখনো অন্ধকার হয়নি। কুমারী ঘরের বাইরে একটি বৃষভ চর্মের উপর বসে আছে। ওর সোনালী চুল গোছা করে বাঁধা। নিচের দিকটা পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে। সামনের চুলের খানিকটা অংশ মুখ ঢেকে রয়েছে। কুমারীর শরীর একটু একটু নড়ছে। দিবোদাস ওখানে পৌঁছাতে লোকজন একটু সরে ওদের যাবার জায়গা করে দেয়। একটা লোক কাছে এসে বলে,—ঘণ্টা দুয়েক আগে ও গন্ধর্ব গৃহীতা হয়েছে। প্রথমে

গা, হাত-পা খুব ঝাঁকুনি দিয়েছিল, গান গাইছিল, কথা বলছিল। এখন লোকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

দিবোদাস সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কুমারী তার দিকে তাকিয়ে বলল,—

—ভরত কুলের রাজা দিবোদাস আমার কথায় নিশ্চয় বিশ্বাস করবে। এ এখন কিলাতদের অভিযানে বেরিয়েছে। কিলাতরা ভীষণ অহঙ্কারী হয়ে গেছে। তারা সুযোগ পেলে শুধু আর্যদের গরু-ঘোড়া লুঠ করে ক্ষান্ত হচ্ছে না। আর্যদের নর-নারীও লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের স্পর্দ্ধার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ওদের মৃত্যু-পাখনা বেরিয়েছে। দিবোদাস নিশ্চয় তাদের সংহার করবে। এইত গতকাল ইন্দ্র দেবীর কাছে এই সব কথা বলছিলেন। আমিও সেখানে থেকে শুনেছি।

—তুমি কে? প্রশ্ন করে দিবোদাস।

—আমি একজন সামান্য গন্ধর্ব। দেব-দেবী কেউ নই। তবে ইন্দ্রের কৃপাপাত্র অনুচর।

—তুমি এখানে আসার ছুটি পেলে কেমন করে? বলল ভুজ্যু।

—ইন্দ্র যার স্বামী তার সুযোগের অভাব হয় না। বলল কুমারী। তিনি তাঁর কৃপাপাত্রদের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখেন। গত সাতদিন যাবত আমি ছুটিতে আছি। এই সময়ে পরুষ্ণী অঞ্চল ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেখানেই এই যুবতী স্নান করতে গিয়েছিল! এর নগ্ন সৌন্দর্য দেখে আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই ওর উপর ভর করে এসেছি। নইলে আজ তোমরা আমাকে এখানে দেখতে পেতে না।

—তুমি মোহিত হয়েছ বলে এই বেচারীকে কষ্ট দিচ্ছ? একে কবে ছেড়ে যাবে?

—সর্বদা ওকে কষ্ট দেবার ইচ্ছা নেই আমার। যতদিন ও

কুমারী থাকবে ততদিন মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে।

কুৎস আর একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—এ সময়ে কিলাতরা কোথায় আছে?

—বহুদূরে, ওদের নিজেদের পাহাড়ের উপর। যেখান থেকে আমরা দূরে শ্বেত পর্বত দেখতে পাই। এখন তাদের আখড়ায় ওরা অভ্যাস করছে। ঐ যে ওদের নেতা শম্বর একটা বাণ ছুঁড়ল, বাণটি বালুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আবার আর একটা বাণ হাতে নিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে। আশেপাশের সকল কিলাতরা আনন্দে লাফালাফি করছে। আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যেমন এখানে দাঁড়িয়ে তোমরা ঐ মানুষগুলোকে দেখছ আমিও ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছি।

—শম্বর কে? কেমন দেখতে? এখান থেকে কতদূরে?

—যদি এখান থেকে ধীরে ধীরে যাও তাহলে কুড়ি দিন লাগবে। খুব তাড়াতাড়ি করলে দশদিনেও যেতে পারো। কিন্তু সামনের ঐ সমস্ত পর্বত কিলাতদের। ওর মধ্যে আর্যরা ঢুকলে একজনও বাঁচতে পারবে না। শম্বর খুব বলবান। বয়সে দিবোদাসের চেয়ে কিছু ছোট, কিন্তু ওর চেয়ে তার বুকের ছাতি অনেক চওড়া, তার বাহু আরো অধিক সবল। তার শরীরও সিংহ চর্মে ঢাকা। মাথায় হিমালয়ের পাখীর পালকের সুন্দর মুকুট।

দিবোদাস সত্য মিথ্যা পরীক্ষা না করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে রাজী নয়। তাই বিশ্বাসের জন্য প্রশ্ন করে,—

—কিন্তু তুমি যে সব কথা বললে তা যে তুমি নিজের মন থেকে বানিয়ে বলছ না তা আমরা কেমন করে বুঝব? এর সত্যাসত্যের প্রমাণ কি?

—বেশ তো পরীক্ষা করে নাও।

—আচ্ছা, আমার ইষুধি ( তূণ ) এখনো ঘোড়ার পিঠে রয়েছে। বলো, আমার কতগুলি বাণ আছে। গন্ধর্ব এতটুকু না চিন্তা করে জবাব দেয়,

—তোমার ঘোড়া এখন দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহের রং হ'ল অরুণ-রং। তার নাম দধ্রিকা। তোমার প্রিয় মৃত ঘোড়ার নাম রেখেছিলে দধ্রিকা, তাই ওর নামও রেখেছ দ্রধ্রিকা। তার পিঠের ডানদিকে তুনীর ঝোলানো রয়েছে ; তার মধ্যে এখন সতেরখানি বাণ আছে।

গন্ধর্ব সব কথাই ঠিক বলেছে। অনেকে গিয়ে দেখে এলো। দিবোদাসও নিজের চোখে গন্ধর্বের কথা যাচাই করে দেখে আশ্চর্য হ'ল। অতপর দিবোদাস বিনয় সহকারে বলল,—গন্ধর্ব! তুমি সত্যবাদী, তুমি নিশ্চয় ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ অনুচর। আর্যরা ইন্দ্রের সত্যিকার ভক্ত, তাই আর্যদের সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি। গন্ধর্ব হেসে বলল,

—ভক্ত অভক্তের কথা ছেড়ে দাও। আমি যদি কোনো কিলাত বা পণিদের মেয়ের উপর ভর করতাম তাহলে তারাও এমনি সম্মান করত আমাকে। কিন্তু আমি জানি ওরা ইন্দ্রের শত্রু। ওরা ওদের দেবকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করে। পণিরাও তাদের শিশ্ন দেবতাকে ছাড়া আর কিছু স্বীকার করে না। তাই ইন্দ্রের অনুচর বলে আমি তোমাদের সহায়ক হতে পারি।

আজ তোমাদের একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি,—আজ থেকে সাত-দিন পর কিলাতরা আর্যভূমি আক্রমণ করবে। তাদের সঙ্গে তোমাদের কঠিন সংঘর্ষ হবে।

দিবোদাস প্রথমে শুধু কৌতূহল বশতঃ গন্ধর্বকে দেখতে এসেছিল। এতখানি কাজ হবে তা ভাবতে পারেনি। আগে অবশ্য এ সব দিবোদাস বিশ্বাস করত না। তবে এখন অবিশ্বাসের আর

কিছু নেই। গন্ধর্ব অতীত ও বর্তমানের কথা বলে সত্যতার প্রমাণ দিয়েছে।

গন্ধর্বের ভবিষ্যদ্বাণীকে আর মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাবধান বাণী উচিতই হয়েছে এবং সময়োচিত হয়েছে। এই সাবধান বাণী যদি সত্য হয় তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা এসেছে সে উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

—এবার আমি চললাম। বলে গন্ধর্ব চলে যায়। কুমারী শিথিল হয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়। নিশ্চেষ্ট, জ্ঞানহীন দেহে যেন সাড়া নেই। ওর চুলের গোছা ভিজে গেছে, মুখে কপালে ঘামের বিন্দু জমে উঠেছে। কয়েকজন লোক ধরাধরি করে কুমারীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়।

দিবোদাস ওর সঙ্গীদের নিয়ে গ্রামজ্যেষ্ঠের বাড়ী ফিরে আসে।

অন্য সময় হলে ওর হয়ত মধুপর্ক বা সোমপানের সময় বয়ে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো লেগে যেত, কিন্তু আজ সকলে গম্ভীর হয়ে কিলাতদের আক্রমণ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত।

এখান থেকে একদিনের রাস্তা দূরে পাহাড়ের নিচে থেকে কিলাতদের ভূমি শুরু হয়েছে। এখানে কেবল শীতের সময়ে বাস করে ওরা। সেই সময়ে এই ভূমিতে ওরা চরিষ্ণু-পুরী বানিয়ে থাকে।

শীত আসতে এখনো দুমাস বাকী। কিন্তু কখনো কখনো ওরা শীতের আগেই নেমে আসে। ভরতজন এবং কিলাতদের সীমান্ত যদিও খুব স্পষ্ট নয় তবে কারো কাছে অজ্ঞাতও নয়।

গন্ধর্বের ভবিষ্যদ্বাণী না শুনলে দিবোদাস সীমান্ত পর্যন্ত যেতে রাজী হত কিনা বলা যায় না। যদিও যাওয়া ঠিক হত তাহলে হয়ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যেত কিনা সন্দেহ।

আর্যদের মধ্যে সকলেই গন্ধর্বের কথায় বিশ্বাস করত না।

আর্যরাই ইন্দ্রের অনন্য ভক্ত বলে প্রসিদ্ধ ছিল অথচ তার মধ্যেও কিছু কিছু লোক ইন্দ্রের অস্তিত্বেও সন্দিহান ছিল। তবে তারা সংখ্যায় এত কম ছিল যে তাদের গুণতি ছিল না।

আবার কেউ কেউ এমন ছিল যারা শপথ করে বলতে পারতো যে ময়ূরের মত পালকওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে ইন্দ্র ঘুরে বেড়ান। তাঁর হাতে বজ্র, মাথায় মুকুট। তাঁর গোঁফ দাড়ী গলিত সোনার মত রং তাঁর গ্রীবা মাংসল, উদর মেদযুক্ত।

ইন্দ্রকে স্বাগত জানাবার জন্য আর্যরা গর্গীর-নামক বাজনা এবং ঢোল বাজায়।

তবুও যারা সন্দেহ করে তারা বলে,—কে দেখেছে ইন্দ্রকে যে তাঁর স্তুতি করব আমরা ?

হয়ত সন্দেহকারীর সংখ্যা আরো অধিক হত যদি না গন্ধর্ব গৃহীতারা দেবদেবীর অস্তিত্বের প্রমাণ দিত।

পুরুকুৎস কিলাতদের সাত-পুরী ধ্বংস করে পর্বতের সমতল ভূমির সকল গোচরভূমি দখল করে নিয়েছিলেন। তখন কিলাতদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত এবং এক একটা যুদ্ধও বেশ বড় রকমের যুদ্ধ হত।

আর্যরা এখনো সে কথা ভোলেনি।

ভরত ভূমির উত্তরদিকের তরাই অঞ্চল শত্রুমুক্ত করতে তেমনি বড় রকমের যুদ্ধ করতে হবে দিবোদাস তা জানত। এখানেও সেই দুর্দ্ধর্ষ কিলাত শত্রু, এবং তাদের নেতা শম্বর।

এমনি দু-চার বার আর্যদের গ্রামে এসে কিরাতরা যে লুঠ-পাট করেছে আর্যরা তার খুব বেশি গুরুত্ব রাখে না। তবে ওরা সুযোগ মত আরো বড় আক্রমণ করবেই এ সম্বন্ধে আর্যরা অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

পাহাড়ের উপর দিকের কিলাত ভূমি সম্বন্ধে আর্যরা কিছুই জানেনা। তাই শত্রুদের তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়।

ভরতদের পুরোধা ঋষি ভরদ্বাজ আগেই বলেছেন কিলাতদের প্রকৃতি পঙ্গপালের মত। মৃত্যুর জন্যে ওরা এতটুকু ভীত নয়। মৃতের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর ভয় শেষ হয়ে যায় ওদের কাছে।

কিলাত সীমান্তের কাছাকাছি আর্যগ্রাম খুব পাতলা। আরো একটু এগিয়ে গেলে শুধু ফাঁকা মাঠ ছাড়া আর কিছু নেই। শুধু বর্ষার সময়েই আর্যরা এদিকে পশু নিয়ে আসে। অন্য সময় কখনো ভুলেও এদিকে আসবার নাম করে না। বর্ষাকালে এই সকল ভূমি নব শষ্য শ্যামলা হয়ে থাকে বলে কিছু কিছু আর্যকে আসতে দেখা যায়।

সীমান্তের কয়েকখানি আর্যগ্রাম লুঠ করে কিলাতরা পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তখন ছিল হেমন্তকাল। তাতে বোঝা যায় ওরা গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শরৎকালে নিচেয় নামে না।

যাবার পথে দিবোদাস কয়েকখানি ধ্বংসপ্রাপ্ত আর্যগ্রাম দেখল। এবার সম্পূর্ণ তৈরী হয়েই চলছিল দিবোদাসের যাত্রা। এই গ্রামগুলির মধ্যে এসেই দিবোদাস আদেশ করে, এই সব গ্রাম আবার তৈরী করে এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করা হোক। তখুনি লোকজন লেগে যায় ভাঙ্গা বাড়ী মেরামত করতে। কয়েকদিনের মধ্যে আবার সেই সব গ্রাম কোলাহলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিবোদাস জানত এই গ্রামগুলি যদি সজীব না হয় তাহলে আর্যসেনার অসুবিধা হবে। কারণ এখান থেকেই সেনাবাহিনীর খাবার ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এখানে পৃষ্ঠচর সেনা জমায়েত করা হল। তাছাড়া ঠিক সীমান্তের উপর নতুন নতুন শিবিরগ্রাম স্থাপন করা হ'ল প্রচুর। এখানেও বহু সৈন্য জমা করা হয়। সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি চল্‌ল। যাতে

যুদ্ধের সময় কারো কোন অসুবিধায় পড়তে না হয় তার সকল বন্দোবস্ত করা হল।

এখন বাকী শুধু যুদ্ধ ঘোষণা।

সে-ত আর্যদের পশুবাহিনী কিলাতদের ভূমিতে ঢুকিয়ে দিতে যতটুকু দেরি। তার অর্থ যুদ্ধ ঘোষণা।

আর্যরা সকল কাজে কিলাতদের দোষ দিত, একথা মুখে বললেও বস্তুতঃ তা নয়। হাজার হাজার বৎসর যাবৎ কিলাতরা এই সব অঞ্চলে বাস করে আসছে। এদের দুটি বিচরণভূমি থাকে। একটা পর্বতের উপরের অঞ্চলে, আর একটা পর্বতের নিচেয় তরাই অঞ্চলে। দারুণ গরম সহ্য করতে না পেরে ওরা গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষাকালে উপরে উঠে যায়। আরো এগিয়ে গেলে সেই উঁচু অধিত্যকায় গিয়ে পৌঁছায় যেখানে বৎসরে দু-তিন মাস হিমযুক্ত হয়ে থাকে। তখন সারা অঞ্চল বরফে ঢাকা পড়ে যায়। বাধ্য হয়ে পশুদল নিয়ে কিলাতরা নিচের দিকে নেমে আসে।

যদি কেউ নিচেয় না আসত তাহলে তারা কোনো গুহার মধ্যে ঢুকে পুরো ছ'টি মাস একটানা ঘুম লাগাত।

কিন্তু কিলাতরা প্রায়ই তা করে না। শিকারের অনুসরণ করতে করতে ওরা নিচেয় নামতে আরম্ভ করে।

কিলাত জাতি মূখ্যতঃ মৃগয়াজীবি। তবে আর্য এবং পণিদের দেখাদেখি কিছু কিছু খেত খামারও করছে কোথাও কোথাও। তাদের চাষ ছিল নতুন শেখা শিশুদের খেলবার মত। পাহাড়ী জঙ্গলের খানিকটা জায়গা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পরিষ্কার করে তার মধ্যে বীজ ঢেলে দিত। আপনাআপনি যতখানি ফসল হত ততখানিই যেন ওদের লাভ হত।

দুই তিন বৎসর পরই আবার সেখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে চাষের ব্যবস্থা করত। খেতের বন্ধনে বাঁধা পড়ত না কখনো।

ওদের রক্তের মধ্যে যাযাবরী জীবন মিশ্রিত। প্রতিদিন যদি মৃগয়া সুলভ হত তাহলে হয়ত পশুপালনও করত না তারা।

গন্ধর্বের কথামত ঠিক সপ্তম দিনেই কিলাতদের আক্রমণ হল না। তবে দু-তিন দিনের বেশি দেরিও হয়নি।

মাছ ধরবার সময় যেমন চার ফেলা হয় তেমনি দিবোদাস কিছু পশু কিলাত ভূমির মধ্যে চরতে পাঠিয়ে দেয়। কিলাতরা একে অসাধারণ ভাবলেও তারা তাদের শত্রু আর্যদের প্রস্তুতির কোনো সংবাদই রাখত না। তাদের সীমানায় আর্যদের পশু চরে বেড়াতে দেখে খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু নির্ণয় করল না। তারা তাদের সবচেয়ে কাছাকাছি ঘাঁটিতে নায়ক শম্বরের কাছে সংবাদ পাঠাল। শম্বর সেই রাত্রেই তার বাহিনী নিয়ে তরাইতে এসে পৌঁছল।

কিলাত নেতা শম্বরও জানে না যে তার জন্য মরণ ফাঁদ পাতা হয়েছে। তার পরদিন সকালে সেই পশুগুলি আবার চরতে এলো। শম্বরের সেনা বাহিনী তাদের হাঁকিয়ে দিল নিজেদের এলাকার ভিতর দিকে। যারা পশু চরাতে এসেছিল তারা ছুটে গিয়ে দিবোদাসকে খবর দিল।

তখন বেলা মাত্র এক প্রহর।

কয়েক সহস্র সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত আর্যসেনা তরাইয়ের উঁচু গাছ আর লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে ছুটল। ওরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে তিন দিক থেকে এগিয়ে চলেছে। প্রথম ভাগের নেতৃত্ব করছে ভুজ্যু, মধ্যভাগে দিবোদাস স্বয়ং, আর অন্যভাগে রয়েছে কুৎস ও আর্জুনেয়।

আর্যসেনা সংখ্যায় ছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত। তাদের বিরাট দল নিয়ে চারিদিক থেকে ঘিরে কিলাত বধ করাই ছিল দিবোদাসের আক্রমণ প্রণালী। তাই ওরা পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ছড়িয়ে গিয়ে ক্রমশ ঘেরা ছোট করে আনতে লাগল।

কিলাত নেতা শম্বর তার দলের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব করছে। কিলাত সেনার এক অংশ আর্যদের পশুগুলি তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। কিছুদূর যেতে না যেতে শম্বর পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল ভুজ্যু তার বাহিনী নিয়ে আসছে ওদের আক্রমণ করতে।

মুহূর্ত মধ্যে কিলাত সেনা ভুজ্যু'র সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করল। সত্যিই ওদের প্রকৃতি অদ্ভুত। ওরা প্রাণ দিতে জানে কিন্তু প্রাণ নিয়ে পালাতে জানে না। ঋষি ভরদ্বাজের সেই পতঙ্গের কাহিনী ভুজ্যুর বেশ মনে আছে। তাই সে খুব সতর্ক হয়ে ক্ষিপ্র-গতিতে প্রত্যাক্রমণ করে কিলাত বাহিনীকে। এই প্রথম যুদ্ধে নিঃসন্দেহে আর্যসেনা কিলাতের চেয়ে সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশি হবে। তাছাড়া আর্যদের মত শক্তিশালী হাতিয়ার কিলাতদের ছিল না। এ সময় আর্যরা তীর ব্যবহার করতে পারে না। জঙ্গলের মধ্যে তীর চালনার সুযোগও পাওয়া যায় না। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে কিলাতসেনা আক্রমণ চালাতে লাগল। কিন্তু ভুজ্যুর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তার প্রহারে কিলাতরা জর্জরিত হয়ে উঠল। ওদের ক্ষতি হতে লাগল ভীষণ। এমন সময়ে দিবোদাস তার বাহিনী নিয়ে কিলাত সেনার পিছন থেকে আক্রমণ করল।

শম্বর তখনও হতাশ হয়নি। ক্ষত বিক্ষত দেহে বিপুল বিক্রমে আর্যসেনাকে প্রহারের পর প্রহার করছে। তখন মাত্র দশ-বারোজন কিলাত সেনা বেঁচে আছে; শম্বর দিবোদাসের বিরাট সংখ্যক সৈন্যের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত কিছু ভেবে নিল। সমস্ত শরীরে তার আঘাতের চিহ্ন। রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে। শরীরটাও বোধ হয় অবশ হয়ে আসছিল। বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে সেইমাত্র দশ-বারোজন সেনানী নিয়ে পালিয়ে যায়।

ভুজ্যু পরিচালিত সেনাদল কিছুদূর ওদের তাড়া করে নিয়ে যায়

কিন্তু পাহাড়ের ভিতর কিলাত সেনার পিছু নেওয়া উচিত নয় ভেবে ফিরে আসে। এক কথায় কিলাতদের পার্বত্য ইঁদুর বলা যায়। পর্বতের মধ্যস্থ প্রতি আঙ্গুল জমি ওদের নখদর্পনে। কখন কোথা থেকে কেমন করে এসে উপস্থিত হবে তা কেউ বলতে পারে না।

মাত্র ৫।৬ ঘণ্টা যুদ্ধের এমন ভয়াবহ দৃশ্য হতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। একদিকে মানব একে অপরকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করছে। একের পর এক অমূল্য মানব-জীবন-দীপ নিভে যাচ্ছে। কারো কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কে কাকে কত তাড়াতাড়ি মারতে পারবে তাই নিয়ে ব্যস্ত।

অন্যদিকে জঙ্গলের প্রকৃত স্বামী বা অধিবাসীরা অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ারের দল একে নেহাৎ তামাশা বলে ভাবতে পারছে না। সিংহ তার থাবার কাছে দশ-বিশটা ঘোড়াকে যাতায়াত করতে দেখেছে কিন্তু তাদের দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকাবার সময় নেই বা সাহস হচ্ছে না। হাতীর দল চুপ করে দেখছে। খাবার না হলেও মারবার মত শত্রু যারা তাদের চিরকালের বিশাল বিচরণ ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের গোচারণ ভূমি করছে, দলে দলে তাদের মুখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু তারাও কিছু বলছে না। বাঘ তাকিয়ে দেখছে প্রাণভয়ে ছুটে তারই পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকা হরিণকে, কিন্তু তাকে মারবার কোনো চেষ্টাই নেই। সকলেই মানবের কোলাহলের দিকে তাকিয়ে আছে। তাছাড়া ছোট ছোট জন্তুরা ত কখন প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

কিন্তু জঙ্গল ছেড়ে তারা যাবেই বা কোথায়? যারা ছুটে চলেছে, চলার পথের সকলেই তাদের অনুসরণ করে ছুটছে।

দিবোদাসের জীবনে এই প্রথমবার কিলাত শত্রুর সঙ্গে পাল্লা পড়েছে। এ যুদ্ধে আর্যসেনা পূর্ণবিজয় লাভ করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব শত্রুরা পড়েছিল তাদের অধিকাংশই মৃত। আহত হয়ে

পড়ে গিয়েও যতক্ষণ তাদের জ্ঞান থাকে ততক্ষণ শত্রুকে আঘাত করতে থাকে।

তারা শত্রুর প্রতি যেমন দয়া দেখাতে জানে না। তেমনি শত্রুর কাছে দয়া পাবার আশাও রাখে না। তাই যতক্ষণ তার দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ তাকে ছেড়ে দেওয়া মানেই নিজের বিপদ ডেকে আনা।

যুদ্ধ শেষ হবার পর শত্রুদের অনেক হাতিয়ার এবং খাদ্য সামগ্রী আর্যদের হস্তগত হয়। যারা মরে পড়েছিল তাদের দিকে একবার তাকিয়ে দিবোদাস তার সেনাবাহিনীকে সীমান্ত শিবিরে ফিরে যাবার আদেশ দেয়।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।

## ॥ সাত ॥

**"ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তি পণয়ঁ। নিধীন বঃ"**

[ খৃঃ পূঃ ১১৯৭ ]                    ( ঋক-১০।১০৮।২ )

পীতকেশী আর্যকন্যা সরমা।

বয়স চল্লিশ-পয়তাল্লিশ-এর বেশি নয়। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু এতটুকু বয়সের ছাপ পড়েনি সারাদেহের কোথাও। গায়ের চামড়ায় কোথাও একটু কুঞ্চন নেই, নেই বয়সের কম্পন।

তাম্রবর্ণ পণিদের গ্রামে পীতকেশী আর্যকন্যার হঠাৎ প্রবেশ। সকলের কাছে আশ্চর্য লাগে বৈকি। গ্রাম্য সরদারের বাড়ীতে বিরাট আঙিনায় উঁচু বেদীর উপর বসে আছে সরমা। গম্ভীর অথচ স্বচ্ছন্দ মূদ্রা। এখানে ভয়ের কিছুই নেই। কারণ যে জাতি সমগ্র সপ্তসিন্ধুতে একচ্ছত্র শাসন করছে, সরমা তাদেরই মেয়ে।

এখান থেকে মূখ্য আর্যনিবাস বহুদূরে। তাই পণি সরদার আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে—সরমা! তুমি কি নিজে ইচ্ছা করে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে এসেছ? কেমন করে ঐ বিরাট নদী পার হয়ে এলে? আর কেনই বা এসেছ এতদূর? পণি সরদারের কণ্ঠে সরল স্বচ্ছন্দ ভাষা। ওদের ব্যবহারে সৌম্যভাব লক্ষ্য করে সরমা। ভয় যে একেবারে নেই তা নয়, তবে সে ভয় প্রভুজাতির প্রতি যেমন সৌজন্যতার খাতিরে করতে হয় তেমনি।

সরমা আর্যনারী হলেও আর্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অহঙ্কারভাব তার মধ্যে খুব বেশি ছিল না।

পণি ওর উপকারের কথা কখনো ভুলতে পারবে না।

প্রয়োজন হলে সরমা ভীষণ কঠোর ভাষায় পণিদের শাসন করে। কিন্তু ওর মনে ওদের জন্য যথেষ্ট দয়া রয়েছে। সরমার হৃদয় যখন কঠোর ভাব ধারণ করে তখন বজ্রের মত, আবার যখন নরম হয় তখন কমল কোমল হৃদয়ে দয়ার পাহাড় যেন।

পণিদের উপর যখন আর্যদের কোপদৃষ্টি পড়ে। শত শত পণিদের মাথা ঘাসের মত দেহ থেকে খসে পড়বার উপক্রম হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে সরমা সেখানে উপস্থিত হয়েই সকলের প্রাণরক্ষাকর্তী হয়ে যায়।

তাই উপকৃত পণির কাছে সরমা দেবীতুল্যা।

দীন-দুঃখীর উপর সরমার যথেষ্ট পক্ষপাত ছিল। তবে নিজের জাতির ক্ষতি করে নয়। যেখানে শ্-পঞ্চাশ আর্যবীরের প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল, সেখানে সরমা গিয়ে উপস্থিত হত।

আজ এই সুদূর পণিগ্রামে ওর একলা উপস্থিতি দেখে ওর নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্যজাতির মধ্যে নর-নারী একে অপরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করতে পারে। কন্যার অনিচ্ছায় পিতা-মাতা নিজের খেয়াল খুশীমত তাকে যার তার সঙ্গে বিবাহ দিতে পারে না।

কিন্তু সাধারণ আর্যনারীর স্বতন্ত্রতা আর সরমার স্বতন্ত্রতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নিজের সঙ্গে যে সমূহ বা দল যাবে সরমা সেই দলের অধিষ্ঠাত্রী। সকলে সরমাকে দেবী বলে মান্য করত।

দেশের মধ্যে প্রবাদ আছে সরমা স্বয়ং দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে। সরমার সঙ্গে সর্বদা কুড়ি-পঁচিশ জন অনুচর থাক্‌ত। তার মধ্যে দু-চার জন ছাড়া বাকী সকলে পণি বা নিষাদ জাতির। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই থাকত তার মধ্যে। সরমাকে স্বাগত জানাবার জন্য পণিগ্রামে বিরাট সভার আয়োজন হত এবং বিদায়ের সময় পণিরা পশু বা ধন দিয়ে বিদায় করত।

সরমার অস্থায়ী আবাসের কোনো ঠিকানা ছিল না। যেখানে যখন খুশী হত সেখানেই তার তাঁবু পড়ত এবং দু-এক মাস সেখানে থাকতেই হত তাকে।

কখনও কোনো দীন-দুঃখী সরমার কাছে হাত পেতে বিফল হয়ে ফিরে যায়নি। আবাসস্থানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভোজনশালায় আগুণ জ্বলত আর যেদিন সেখান থেকে চলে যেত সেইদিন উনুন নিভিয়ে যাওয়া হত। বড় বড় হাঁড়িতে মাংস দিনের পর দিন সিদ্ধ হত। বড় বড় উনুনে রুটি তৈরীর বিশ্রাম যেত না। ছাতুর পাহাড় জমানো থাকত। যেন মহোৎসব লেগেছে।

আর্যজাতি ছাতুকে খুব ভালবাসত। কিন্তু সরমার লঙ্গরখানায় চাল বা গমের প্রচলন ছিল বেশি। তাছাড়া পণিরা মোষ-এর মাংস ভালবাসত বলে তাদের জন্য মোষ মেরে রান্না হত। সরমার লঙ্গরখানার দরজা সকলের জন্য সর্বদা খোলা থাকত।

সমগ্র সপ্তসিন্ধুতে সরমা এত জনপ্রিয় হবার প্রধান কারণ ছিল, সরমা ছিল অজাতশত্রু।

চল্লিশ বৎসর পার হয়ে যাবার পরেও সরমার রূপ-লাবণ্য দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যেত না। যৌবনে বোধ হয় সপ্তসিন্ধুর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিল। সাধারণ মানুষ ভাবত আঙ্গিরস কুলের ললনা, জন-কল্যানী, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সরমার সেই ভুবন-মোহিনী রূপে কি কখনো কোনো পুরুষ ভোলেনি? কখনো কি সরমা কোনো তরুণকে ভালবাসেনি? ওর সেই অনন্য রূপসুধা কি কেউ পান করে ধন্য হয়নি?

যদি হয়ে থাকে তবে কে সেই ভাগ্যবান?

ছিল এক তরুণ আর্যকুমার। সে সরমাকে এবং সরমা তাকে প্রাণ-মন দান করেছিল। বিবাহের সব পাকা ব্যবস্থাও হয়েছিল।

কিন্তু বিধি বোধ হয় ওর ভাগ্যে তত সুখ লেখেননি। তাই বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হয়েছিল সরমাকে।

সে এক করুণ ইতিহাস।

সরমার বয়স তখন কুড়ি।

যৌবনের সৌন্দর্য ওর দেহের কানায় কানায় উপচে পড়ছে। যে দেখে সে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। শিল্পী ওকে একবার দেখে তার মানস মনের কল্পনায় ওর মূর্তি গড়ে। কবি ওকে দেখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে কবিতা রচনা করে।

দুধে-আলতা রং ছিল ওর। গলিত সোনার মত ছিল রাশিকৃত চুল। রূপের ভারে সরমা ধীর স্থির। ফলভারে নুয়ে-পড়া দ্রাক্ষালতা যেন। নদীর তীরে কুঞ্জবনে সেই বিকেল থেকে দুই ভ্রমর-ভ্রমরী গুণ গুণ করতে করতে এমন ভুলে যেত যে রাতের হিসাব থাকত না কারো মনে।

আকাশের বুকে পূর্ণিমার চাঁদ। নদীর জলে পড়েছে তার প্রতিবিম্ব। হাল্কা হাওয়ায় নদীর জল ঝির ঝির করে কাঁপতে থাকে। সেই জলের প্রতিফলন এসে সরমার মুখে আছাড় খেয়ে পড়ে। সরমা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,—দেখ, কী চমৎকার।

—কি? আচমকা প্রশ্ন শুনে অবাক হয় তরুণ।

—আকাশের চাঁদ। আজ পূর্ণিমা।

—না।

সরমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,

—কি, না?

—চাঁদ মোটেই চমৎকার নয়।

—তবে?

—চাঁদ যদি তোমার জন্মাবার পরে জন্মাতো তাহলে নিশ্চয় ও আকাশে মুখ দেখাত না।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ আমার চোখে ঐ আকাশের চাঁদের চেয়েও সুন্দর বলে কিছু আছে।

—কে সে ? কি সে বস্তু ? সরমা চোখ বড় বড় করে তাকায় তরুণের দিকে। তরুণ দুই হাত দিয়ে সরমার মুখখানা নদীর দিকে আরো খানিকটা ঘুরিয়ে ধরে বলে,

—আমার সরমা। চাঁদের বুকে কত কলঙ্ক দেখেছ ?

—দেখেছি।

—তোমার মুখে আছে সে কলঙ্ক ? তুমিই বলো।

সরমা লজ্জায় মাথা নিচু করে। উত্তর দেয় না তার প্রেমিকের কথার। তরুণ ওর মাথাটা টেনে নেয় নিজের কোলের মধ্যে। সরমার অনিন্দসুন্দর কমল-কোমল দেহবল্লরী বিনাদ্বিধায় সমর্পণ করে প্রেমিকের কাছে।

—কি, কথা বলছ না যে ? প্রশ্ন করে তরুণ।

—তুমি ত বলছ। তুমিই বলো, আমি শুনি।

—ভাবছি চাঁদের আলো আমার চেয়েও ভাগ্যবান।

—কেন ?

—ঐ দেখনা নদীর জলের মধ্যে চাঁদের চ্ছটা ঠিকরে এসে তোমাকে সুখে কেমন নিঃশব্দে চোরা চুম্বন করছে।

সরমা একবার নদীর জলের দিকে তাকায়। চিক চিক করে নদীর জল থেকে চাঁদের আলোর চ্ছটা ওর মুখে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। সরমা কথা বলে না, শুধু দেখে।

—কি কথা বলছ না যে ?

—তুমি বলো, আমি শুনি। এমনি করে অনন্তকাল তুমি বলো। এ-বলার যেন শেষ না হয়।

কিন্তু হায়।

পৃথিবীতে যা কিছু শুরু হয় তার শেষও একদিন হয়।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সরমার স্বপ্নালোকিত জীবনে যে অমাবস্যার তিমির অন্ধকার এসে গ্রাস করবে তা কে জানত?

কয়েকদিন পর একদিন খবর পেয়ে পর্বতের পাশের জঙ্গলে পণিদের চারণভূমিতে আর্যসেনা গেল পশু লুঠ করে আনতে। সঙ্গে গেল সরমার প্রেমিক তরুণ।

পণিরা অপ্রস্তুত ছিল না। বেশ বড় রকমের সঙ্ঘর্ষ হল তাদের সঙ্গে। সেই যুদ্ধে সরমার প্রেমিক আহত হয়ে বন্দী হ'ল। আর্য-সেনা ফিরে এসে আবার গেল বিরাট বাহিনী নিয়ে তরুণ বন্দীকে ছাড়িয়ে আনতে।

কিন্তু তারা তরুণকে জীবিত ফিরিয়ে আনতে পারল না।

বিংশবর্ষীয়া সুশিক্ষিতা আর্যকন্যা সরমা তখন সাবালিকা এবং পক্কবুদ্ধি। তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, তার ভবিষ্যত, সেই তরুণের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কিছুদিন যাবত কথা বলতে ভুলে গেল সরমা।

প্রতিদিন বিকেল হলে নদীর ধারে কুঞ্জবনের সেই পাথরখানার উপর গিয়ে বসে একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকত। কোনো কোনো দিন রাত্রি শেষ হয়ে যেত কিন্তু সরমার প্রতীক্ষার শেষ হত না।

ধীরে ধীরে সে ভাবটা কেটে যেতে সরমা প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর বিবাহ করবে না। তখন থেকে ওর উপরটা ভয়ানক কঠোর বলে মনে হত।

বাকী জীবনটা গরীব দুঃখীদের সেবায় কাটিয়ে দেবে বলে ঠিক করল। নিজের দুঃখ দিয়ে অপরের দুঃখ অনুভব করল। সাদা-কালো, হলুদ-তাম্র, আর্য অথবা নিষাদ-কিলাত, সকলের দুঃখই সমান কষ্টদায়ক।

সেই থেকে গরীব দুঃখীর সেবার ভার নিয়েছে সরমা। ওদের

সেবা করে ও ভীষণ আনন্দ পেত মনে। সেদিনকার সেই ইচ্ছা আরো কিছুকাল পরে ওর জীবনের উদ্দেশ্য বলে স্থায়িত্ব পেল।

সরমার কথা সপ্তসিন্ধুর আর্য-অনার্যের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। কোথাও কোথাও সত্যকে ছাড়িয়ে ওর কথা গল্পচ্ছলে বলা হতে লাগল।

পণিরা সরমাকে মহামাতা, পৃথিবীমাতা বলে মানতে শুরু করল।

সরমার জীবন যাযাবর জীবন। সদা সর্বদা এখান থেকে সেখানে ঘুরছে ত ঘুরছে। চলার যেন শেষ নেই, বিরাম নেই। আজ এখানে ত কাল অন্যস্থানে। কখনো আর্যগ্রামে, আবার কখনো সুদূর নিষাদ পল্লীতে।

এবারেও শতদ্রু-পরুষ্ণীর সঙ্গম পার হয়ে আরো অনেক দক্ষিণে এসে পৌঁছেছে। এখান থেকে মহামরুভূমি মাত্র কয়েকদিনের দূরত্ব। এদিকে আর্যগ্রাম খুব কম। তবুও সরমা এখানে আসা একান্ত দরকার মনে করেই এসেছে।

কিছুদিন যাবত এদিকের পণিদের সঙ্গে আর্যদের সম্বন্ধ ক্রমাগত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। পণিরা অবশ্য তাদের শাসক জাতির শাসন অমান্য করবার মত সাহস করে না, তবুও সহ্যেরও ত একটা সীমা আছে।

আর্যদের কাছে একটা তুচ্ছ ঘটনার ছুতো হলেই যথেষ্ট। অমনি ওদের সর্বনাশ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। যদিও এদের সর্বনাশ করা তাদের দেবতারও অসাধ্য। কারণ এদিকে পণিদের সংখ্যা লক্ষেরও বেশি। অকারণ এই সুখী মানুষগুলিকে মেরে মাংসের ঢিবি তৈরী করা সহজসাধ্য নয়।

তাছাড়া তা যদি করাও হয় ত আর্যদেরই ক্ষতি হবে বেশি। কারণ আর্যদের কাছে পণিরা ওদের ধেনু গাইয়ের চেয়েও বেশি। পণিদের কৃষি এবং পশুদের মধ্যে আর্যদের ভাগ আছে। ওদের

শিল্প এবং ব্যবসায়ে আর্য সামন্তরা তাদের সুখ-সুবিধার সামগ্রী অনায়াসে পেয়ে থাকে।

পণি আয়ুধকার সুন্দর সুন্দর তীক্ষ্ণ, মজবুত অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে আর্যদের জন্যে। অতএব তাদের একেবারে উচ্ছেদ করলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে। কিন্তু সরমা জানত আর্যদের কোপদৃষ্টি কেমন হয়ে থাকে। সেই কোপ থেকে এদের বাঁচাবার জন্যই আজ এত বড় বড় পাহাড়, জঙ্গল, নদী ডিঙিয়ে এতদূর এসেছে। এখানে চারিদিকে পণিদের গ্রামগুলি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। এদের ঐশ্বর্যের কথা শুনে 'আর্য' এবং "অসিলে" এদিকে এসে লুঠপাঠ করবার জন্য তৈরী হচ্ছিল।

সরমা ভাবল আর্যদের বাঞ্ছিত ধন তারা যদি অপ্রয়াসে পেয়ে যায় তাহলে অহেতু লুঠপাঠ নরহত্যা থেকে এদের বাঁচানো যায়। তাই শরতকালেই ও এতদূর চলে এসেছে।

আজ দুই-তিন দিন হ'ল সরমা পণিদের আতিথ্য স্বীকার করেছে। তার কথা শুনবার জন্য বহুদূরের গ্রাম থেকে পণি সরদাররা এসেছে। কিন্তু এই দুই জাতির সম্বন্ধ এমন তিক্ত হয়ে গেছে যে সরমার কথা তাদের গলার নিচেয় নামছে না। আর্যদূতী, ইন্দ্রদূতী সরমা বলছিল,—

—হে পণি! আমি ইন্দ্রের দূতী হয়ে তোমাদের ভারী নিধির সন্ধানে এসেছি। ইন্দ্রের ভয় থেকে আমি মুক্ত হতে পেরেছি বলে ঐ নদীর জলধারা অনায়াসে পার হয়ে এখানে আসতে পেরেছি।

পণিদের একজন বড় সরদার হেসে সরমার কথার উত্তরে বলল,

—সরমা! আমরা তোমার হৃদয়কে জানি। আমরা জানি তুমি আমাদের নিধির সন্ধান করতে আসোনি।

—না আমি সেই জন্যেই এসেছি, এবং ইন্দ্রের ইচ্ছানুসারেই এসেছি।

—সরমা, তুমি বলতে পারো ইন্দ্রকে দেখতে কেমন? ইন্দ্র সশরীরি অথবা অশরীরি? যার দূতীপনা করবার জন্য এতদূর এসেছ তাকেই পাঠিয়ে দাওনা কেন, আমরা তাকে আমাদের মিত্র বানিয়ে রাখব। সে আমাদের গরু চরাবে আর মনের আনন্দে এখানে বাস করবে। যত গরু চাইবে তাকে দেব আমরা।

সরমা গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

—ইন্দ্র অজেয়। কঠিন কঠিন বিপদ তাঁর রাস্তা বন্ধ করতে পারবে না। তাঁর একটি বজ্রের আঘাতে তোমাদের সকল পণি-জাতির মানুষ ও পশু শুয়ে পড়বে চিরনিদ্রায়।

—হে সুভগে! আবার সরদার সরমাকে বোঝোতে চেষ্টা করে, —আমাদের পশু দিগন্ত পর্যন্ত ছেয়ে আছে, তাই তাদের নেবার জন্য ইন্দ্র তোমাকে পাঠিয়েছেন, ইন্দ্রের কথা আমরা বিশ্বাস করি না। লোলুপ পীতকেশী আর্যরা তোমার মুখ দিয়ে আমাদের ধমক দিতে পাঠিয়েছে। কিন্তু বিনা যুদ্ধে আমাদের গরুকে স্পর্শ করতেও দেব না আমরা। আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, একথা যেন পীতকেশীরা ভুলে না যায়।

—না তারা ভোলেনি। আর তোমরাও ভুলো না তাদের সব অস্ত্র-শস্ত্র তোমাদেরই হাতের তৈরী। কিন্তু হে পণি সরদার, তোমাদের কাছে যত তীক্ষ্ণ অস্ত্রই থাকুক না কেন, তোমরা তার সঠিক উপযোগ জানো না। আর আর্যদের বাণের সামনে তোমাদের শরীর অভেদ্য নয়। মনে রেখ দেবগুরু বৃহস্পতি তোমাদের বিরুদ্ধে আর্যদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন।

—কিন্তু সরমা যে কেউ তাদের সহায়তা করুক না কেন, দুর্গম পর্বতের মধ্যে আমাদের মূল্যবান সম্পত্তি আমাদের দুধর্ষ যোদ্ধা পাহারা দিচ্ছে। সেখানে গিয়ে পৌঁছনো আর্যসেনার সাধ্যের বাইরে। সরমা মৃদুভাবে উত্তর দেয়,

—একথা বলা ভুল, সরদার। অয়াস, আঙ্গিরস, নবগু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আর্য সেনা যখন সোমপান করে মত্ত হয়ে উত্তাল তরঙ্গমালার মত তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন কারো সাধ্য নেই সে তরঙ্গ রোধ করে। সে সংহারলীলা তোমরা ভাবতেও পারবে না কতখানি ভয়ানক হতে পারে। তখন তুমি বুঝতে পারবে তোমার সব বীরত্ব শুধু বাজে বকবকানি ছাড়া কিছুই নয়।

—সরমা! মৃদু হেসে বলল পণি সরদার। আমরা বুঝতে পারছি পীতকেশী তোমাকে বাধ্য করেছে এখানে আসতে। যাই হোক তুমি এখান থেকে ফিরে যেও না। আমরা তোমাকে আপন বোনের মত সসম্মানে রেখে দেব। হে সুভগে! তুমি যত গরু, ঘোড়া, মেষ চাও তোমাকে আমরা হসিমুখে দিতে রাজী আছি। বলো তুমি নিজের জন্য কি চাও? অনেকবার আমরা তোমাকে বহু গরু দিয়েছি কিন্তু তা তুমি আমাদেরই জাতির দরিদ্রদের দান করে দিয়েছ। সরমা, কৃপা করে তুমি আমাদের বোন হয়ে এখানে থাকতে রাজী হও। আমরা আর কিছু চাই না।

—আমি চিরকালই তোমাদের বোন হয়ে আছি এবং থাকব। তবে কোনো একস্থানে স্থায়ী হয়ে ত আমি থাকতে পারি না। যাই হোক এখন আবহাওয়া যেমন আমি সেই রকম অবস্থায় যা ভাল বিবেচনা করলাম বলে দিলাম।

ইন্দ্র এবং আঙ্গিরস তোমাদের গোধন নেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা যতক্ষণ না পাবে ততক্ষণ শান্তির নিশ্বাস ফেলবে না। অতএব তোমরা এখুনিই এখান থেকে পালাও। নইলে ভয়ানক বিপদ তোমাদের মাথার উপর ঘনিয়ে আসছে।

পালিয়ে যাও বললেই পালিয়ে যাওয়া যায় না। পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? পণিজাতি শুধু পশুধনে ধনী নয়। ওদের সুন্দর নগর, গ্রামগুলি ভর্তি রয়েছে অপার ধন সম্পত্তিতে। এই সব সম্পত্তি ওরা

বংশ পরম্পরায় বহুকষ্টে অর্জন করে জমা করে আসছে। তাই আজ বিনা সঙ্ঘর্ষে সব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়।

অতঃপর সঙ্ঘর্ষ একদিন সত্যিই ছড়িয়ে পড়ল। এ সঙ্ঘর্ষ সাধারণ লুঠপাট নয়। সরমার জীবনে এই প্রথমবার হার স্বীকার করতে হ'ল। যে বিবাদ সরমা মেটাতে পারেনি সে বিবাদ সাধারণ বিবাদ নয়।

সপ্তসিন্ধুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পণিজাতির সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। সেই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে একদিনে আগুন জ্বলে উঠল।

মাত্র গতকাল যে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত, আজ তার চোখে ভয়ানক প্রতিহিংসার ছায়া—অতিবড় সাহসীরও বুক শুকিয়ে যায়।

মরবার জন্য যে তৈরী হয়েছে তার আবার ভয় কিসের ?

এই অঞ্চলটা ছিল যদু তুর্বশ ভূমির সীমান্তের কাছাকাছি। একদিকে বিশাল হিমালয় ওদের অঞ্চলকে প্রাচীর দিয়ে রক্ষা করছে, অন্যদিকে মহামরুভূমি শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

দিনের পর দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগল। লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকছে, তবুও আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের বিরাম নেই।

প্রথম দিকে আর্যরা ভীষণভাবে হারতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে ভরতরাজ দিবোদাস আর্যসেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সপ্তসিন্ধুর সকল আর্যজাতি একসঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিল।

রাস্তায় ছোট বড় অনেকগুলি সঙ্ঘর্ষের পর আর্যসেনা সেখানে গিয়ে পৌঁছল। নিম্ন সিন্ধুর পূবদিকে কিছুদূরে যে পর্বতমালা রয়েছে সেখানে পণিদের অভেদ্য দুর্গ হয়েছে। তার অপর পাশে মরুভূমি। নিজেদের উটের সাহায্যে পণিরা মরুভূমির ভিতর

অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারে। এখানে আর্যদের ঘোড়া যত শক্তিশালী হোক না কেন তার কোনো মূল্য নেই।

উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে ছোট পাহাড়ী এলাকায় এখনো কিলাতদের সঙ্গে আর্যসেনার যুদ্ধ চলছে।

এ ঘাঁটিতে দিবোদাসকে থাকতে হ'ল।

উত্তর এবং দক্ষিণে তুই দিকেই আর্যসেনাকে ভীষণভাবে যুদ্ধ করতে হ'ল। আর্যজাতির সৌভাগ্য বলা যায় যে পণি এবং কিলাত জাতি একসঙ্গে আর্যসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার প্রয়াস করেনি। জাতিভেদ এবং স্থানের দূরত্ব এই যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ; নইলে আর্যজাতির ভাগ্য বোধ হয় অন্যভাবে পরিচালিত হত।

আর্যোচিত প্রণালীতে যুদ্ধের ব্যবস্থা করেছে দিবোদাস। ওদের বীর সেনানীর অভাব নেই। দিবোদাস তার সবচেয়ে যোগ্য সেনানী শ্যামপুত্র তোগ্য ভুজ্যুকে দক্ষিণ ঘাঁটির প্রধান নিযুক্ত করে। দিবোদাস জানত ভরতভূমির দক্ষিণে ভুজ্যুর সমতুল্য যোদ্ধা এবং কুশল সেনাপতি আর কেউ নেই।

কিন্তু ভুজ্যু যত এগিয়ে যেতে লাগল তার সামনে তত বেশি অসুবিধা দেখা দিতে লাগল।

পণিরা সকলে জেনে গেছে আর্য তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে এগিয়ে আসছে। যারা ধন নিয়ে পালাতে পারেনি তাদের ঘরের মধ্যেই পুড়িয়ে মারছে।

এই অঞ্চলে মাঝে মধ্যে তু-চারটা যা আর্যগ্রাম ছিল তা পণি দস্যুরা পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। ভুজ্যু সময়মত তার স্বজাতিকে রক্ষা করতে পৌঁছতে পারেনি। তাই ভুজ্যু যাকে সামনে পেল সকল নিরীহ পণির উপর তার তরবারী চালিয়ে যেতে লাগল নির্বিচারে।

তবুও একশ জন পণিকে হত্যা করতে গিয়ে কম করে দশজন আর্যের প্রাণান্ত হচ্ছে। ভুজ্যু ভেবেছিল ঐ সব আর্যগ্রাম থেকে তার সেনার অনেকখানি সাহায্য হবে, কিন্তু এখানে এসে দেখল সব শেষ।

তাই পথে নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগুতে হচ্ছিল তাকে। পণিরা গ্রাম ত্যাগ করে গহন জঙ্গলে গিয়ে শক্ত করে ঘাঁটি তৈরী করেছে। আর্যসেনার সঙ্গে পথ চলার মত সামান্য রসদপত্র থাকত আর মূল ঘাঁটি থেকে নিয়মিত রসদ পৌঁছত। পণিরা সেই সব রসদবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে সব লুঠ-পাট করে নিতে লাগল। ফলে ভুজ্যুর বাহিনীকে এক এক সময় ভীষণ সমস্যায় পড়তে হতে লাগল। তাছাড়া রাস্তার আশ পাশের কুঁয়ো বা ছোট খাটো জলাশয়গুলিতে বিষ ঢেলে দিয়ে দিয়ে পণিরা সব জল নষ্ট করে দিয়েছে। আর্যসেনার খাবার অভাব না হলেও জলের ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল।

একটি একটি করে দেখে দেখে পা রেখে চলতে হচ্ছিল আর্য-সেনার। অগত্যা বেশির ভাগ নদীর তীর বরাবর চলতে হচ্ছিল ভুজ্যুকে। দিবোদাস অনুভব করছিল যে একমাত্র ভুজ্যুর দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে এত কম ক্ষতি সহ্য করে এত তাড়াতাড়ি সাফল্যের সঙ্গে শত্রুকে পিছন দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।

একের পর এক পণি নগরী লুঠ করে রাশি রাশি রত্ন আর সোনা আর্যসেনার হস্তগত হতে লাগল। তার মধ্যে কিছু কিছু লুণ্ঠনকারী যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বাকী সব দিবোদাসের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ভুজ্যু।

এই সমস্ত রত্নালঙ্কারাদি দেখে দিবোদাসের চোখ ঝলসে যায়। পণির কাছে এত ধনরত্নাদি হতে পারে তা চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না দিবোদাসের।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ পণি আর্যজাতির অধীন হলেও এমন বহু পণি-ভূমি রয়েছে যাদের এখনো জয় করা সম্ভব হয়নি। এখনো সমুদ্র-তটের এবং সিন্ধুর পশ্চিমে অনেক ভূখণ্ড রয়েছে যারা আর্যদের নাম পর্যন্ত জানে না বা আর্য অধীনতার টক-মিষ্টি স্বাদের সঙ্গে পরিচিত নয়।

কিন্তু এবার পীত কেশীর অত্যাচারের কাহিনী তাদেরও কানে গিয়ে পৌঁছাল। স্বজাতীর সহায়তা করতে তারা বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। এরা সপ্তসিন্ধুর অধিবাসী পণিদের মত ভীরু এবং নম্র স্বভাবের নয়। এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা বেশ কষ্টসাধ্য।

যদিও আর্যদের সবচেয়ে বড় সহায় ছিল ঘোড়া। কিন্তু এই সব প্রবাসী পণিরাও কম নয়। আর্যদের অশ্বের কাছে ওরা দমে যায় বটে, তবে যেখানে নদী আছে সেখানে ওদের নৌকার কাছে আর্যের অশ্ব একেবারে নির্ভুল প্রমাণিত হতে লাগল। শত শত পাল, তোলা নৌকায় চেপে হাজারে হাজারে পণিযোদ্ধা অনায়াসে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছতে লাগল।

ভুজ্যুর সেনাবাহিনী এগুতে এগুতে সেই পাহাড়ের সীমানায় গিয়ে পৌঁছায় যেখানে সরমার কথামত পণিদের অপার ধনরাশি লুকানো ছিল।

পাহাড়ের উপর উঠে ওপারের দৃশ্য দেখে ভুজ্যু ভীষণ আশ্চর্য হল।

একদিকে ভয়ঙ্কর মরুভূমি। ধূ ধূ করছে অস্তত বালুকারাশি। অন্যদিকে চমৎকার শষ্যশ্যামল বনানী। ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। খেত খালি পড়ে আছে। যব, গম এখনো কাটা হয়নি। সেই সব খেতগুলি এমন সুন্দর ফলে ফুলে ভরে আছে যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

একদিকে শুষ্ক মরুভূমি অন্যদিকে সুন্দর সাজানো পণি-নগরী। এই দুই সম্পূর্ণ বিরোধী দৃশ্যের পাশাপাশী সংযোগ দেখে ভুজ্যু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

পূর্বেকার চেয়ে এদের জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া বহুদূর থেকে পালিয়ে এসে বহু সংখ্যক পণি আশ্রয় নিয়েছে এখানে। গ্রামগুলি দেখে আর্যরা খুব খুশী হ'ল। কারণ এমন জায়গায় এসে যুদ্ধ করবার সুযোগ এর আগে ওদের হয়নি।

পাহাড়ী এলাকার ভিতরে গিয়ে ওদের ধারণা বদলে যায়। এখানকার আহত-নিহত শত্রুদের দেখে ওরা বুঝতে পারে এরা সাধারণ পণি নয়। দূর থেকে এই সব যোদ্ধারা এখানে যুদ্ধ করবার জন্য এসেছে।

পণিরা যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্ভীক কিন্তু অস্ত্রচালনায় আর্যদের মত ওদের হাত অত পাকা নয়। তাছাড়া ওদের মধ্যে ভালো নেতার অভাব। তাই বলে এ সময়ে ওরা নেতাহীন নয়। এক এক পা করে যুদ্ধ করে তবে এগুতে হয় ভুজ্যুকে। সামনে ওদের পাহাড়ী দুর্গ। এই ভীষণ মজবুত দুর্গে ওদের সবচেয়ে কুশলী সেনানী রয়েছে। এতদিন যুদ্ধ করে এতদূর আসতে আর্যসেনার হানি হয়েছে খুবই কম। কিন্তু এখন তার হিসাব নিকাশ হতে চলেছে। এত সৈন্যহানি এর আগে আর কখনো হয়নি।

ভুজ্যু ভাবছিল পণিদের সম্পূর্ণ পরাজিত করলেও এই ভূমির উপর ওরা অধিকার বজায় রাখতে পারবে না। আর্যজনের কেউ তাদের ভারী সংখ্যা নিয়ে এতদূরে এসে স্থায়ী বাস করতে রাজী হবে না।

অতএব জয়লাভ করবার পর এই ভূমিকে এমনি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর এমনি ফিরে যাবার অর্থ হার স্বীকার করা।

দুর্গটিকে অধিকার করতে না পারা পর্যন্ত পণিদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করা সম্ভব নয়। ঐ দুর্গের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র এবং রসদ-পত্র মজুত রয়েছে।

তাছাড়া সবচেয়ে বড় অসুবিধা হ'ল শত্রুর ভেদ জানাবার জন্য ওদের কোনো ব্যবস্থাই নেই। আর্য এবং পণিদের দেহের রঙে এত পার্থক্য যে ইচ্ছা করলেও আর্য তা লুকোতে পারে না। অতএব গুপ্তচরবৃত্তি অচল।

বর্ণশঙ্কর সন্তান যদিও যথেষ্ট ছিল কিন্তু তাদের সঙ্গে আর্যদের যা ব্যবহার তাতে তারা প্রথমত আর্যদের সহায়তা করতে রাজী হবে না; আর হলেও তাদের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

দুর্গের নিচেয় আর্যসেনা এসে জমায়েত হয়েছে। সেখান থেকে কয়েক জন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে দুর্গের ঠিক নিচেয় গিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করে। তার মধ্যে বেশির ভাগ পা পিছলে নিচেয় এসে পড়ে আহত হয়, আর যা দু-একজন কিছুটা দূর ওঠে তাদের পাথর ছুঁড়ে ফেলে দেয় পণিসেনা। পাহাড়টা এমন খাড়া যে হঠাৎ তার উপর চড়াই করা অসম্ভব বললেই হয়।

এমনি সারাদিন সারারাত্রে কমপক্ষে পঞ্চাশ বার ভুজ্যুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। তখন ভুজ্যু উপস্থিত আর্য সেনানীদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল।

—শঙ্কর পণি শম্বুর কথাটা একবার পরীক্ষা করলে কেমন হয়? বলল ভুজ্যু।

—কি? জবাব দেয় একজন আর্য সরদার।

—শম্বু বলছে মরুভূমির দিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে, সেইদিক দিয়ে গেলে দুর্গে পৌঁছানো যেতে পারে।

—কিন্তু অর্দ্ধ-পণির কথায় বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—সে ত আমিও ভেবেছি। কি জানি মরুভূমির মধ্যে আবার নতুন কোনো সঙ্কট এসে মাথায় চাপবে কি না। তাছাড়া ত আর উপায় দেখছি না।

একদিনেরও বেশি মরুভূমির রাস্তা চলতে হবে। বস্তুত এখানে কোনো রাস্তা নেই। পথপ্রদর্শকের উপর বিশ্বাস করেই রাস্তা চলতে হবে। যদিও এখানে গুপ্ত শত্রুর তেমন ভয় নেই, কিন্তু পথ যদি একবার ভুল হয়ে যায় তাহলেই মহাসর্বনাশ। এই ভয়ানক মরুকান্তারে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সকলের প্রাণ যাবে।

শেষ পর্যন্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ভুজ্যু রওয়ানা হ'ল। সঙ্গে রইল পথপ্রদর্শক পণি-শঙ্কর শম্বু। চলতে চলতে সর্বদা শম্বুর হাব-ভাবের দিকে নজর রাখে ভুজ্যু। উটের পিঠে ওরা যাত্রা করে। প্রায় এক দণ্ড চলবার পর মরুকান্তার আরম্ভ হয়।

ভুজ্যু তার জীবনে এই প্রথম মরুভূমি দেখল। এতদিন মরুভূমি সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছে। শুনে শুনে ওর মনের মধ্যে মরুভূমি সম্বন্ধে যে ছবি এঁকেছিল আজ প্রত্যক্ষ মরুভূমি দেখে ও ভাবছিল ওর সেই কল্পনার মরুভূমি কত না সুন্দর ছিল।

সীমান্তে এসে পাশের জঙ্গলে ওরা আস্তানা করল। দিনের বেলা মরুভূমি যাত্রা ভয়ানক বিপদজনক। তাছাড়া এখান থেকে সব ব্যবস্থা করে নিতে হবে। যাতে অন্য কারো কাছে আসল রহস্য ফাঁস না হয় সেজন্য একমাত্র পথপ্রদর্শক ছাড়া অন্যজাতের কাউকে সঙ্গে নেওয়া হ'ল না। সারাদিন সকলে এখানে সেখানে লুকিয়ে পড়ে রইল।

সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় সব ফাঁকা। একটি লোকজনেরও দেখা সাক্ষাত পাওয়া যায় না। দিনের তৃতীয় প্রহরে রৌদ্র খানিকটা মোলায়েম হয়ে আসে। তখন উটের সার্থ (যাত্রীদল) রওয়ানা হ'ল।

প্রতি উটের উপর দুজন করে লোক। রাস্তা চলবার ও যুদ্ধ করবার সকল ব্যবস্থাই রয়েছে তাদের সঙ্গে।

খানিকক্ষণ চলবার পর মনে হ'ল এ-এক নতুন পৃথিবী। কোথাও শ্যামলিমার নাম গন্ধ নেই। পায়ের তলায় আশে পাশে যে দিকে চোখ যায় শুধু বালু আর বালু, আর মাথার উপর অখণ্ড নীল আকাশ। কোথাও কোনো প্রাণীর পদচিহ্ন নেই।

নিঃশব্দে সার্থ চলছে অজানা পথে। কেউ চেনেনা পথের নিশানা। শুধু পথপ্রদর্শকের উপর ভরসা। সূর্য অস্ত যেতে যেতে সকল দিক সমান হয়ে যায়। কেউ জানেনা কোন দিকে চলেছে।

হয়ত শম্বু দুর্গের দিকে নিয়ে না গিয়ে দুস্তর মরুভূমির দিকে নিয়ে চলেছে। চিন্তা করতে করতে ভুজ্যুর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—আমরা ঠিক রাস্তায় চলছি ত? ভুজ্যু শম্বুকে প্রশ্ন করে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা ঠিকই চলেছি। আমি একাধিকবার এই রাস্তায় আসাযাওয়া করেছি। তাছাড়া আমাদের এই উট কখনোই রাস্তা ভুল করবে না।

ভুজ্যু ভাবছিল একটা মানুষের চেয়ে কি একটা উট বেশী জ্ঞানী হতে পারে? মানুষের চেয়ে উট কি করে বেশি সতর্ক হয়! যাই হোক এখন হাতের তীর হাত থেকে ছুটে গেছে। যদি ওরা ফিরে যাবারও চেষ্টা করে তাহলেও শম্বুর উপর ভরসা করে চলতে হবে। তবে ওর একমাত্র ভরসা ছিল যে প্রাণের মায়া সকলেরই আছে।

অর্দ্ধেক রাত পর্যন্ত সার্থ তেমনি চলতে থাকল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলে চুপচাপ। উটের নরম পা বালুর উপর শব্দ করে না। এই নীরবতাও সকলের কাছে অসহ্য মনে হয়। আরো কিছুদূর চলার পর আকাশের তারা দেখে শম্বু বলে এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে। তখন সকলের মনের উপর থেকে যেন

পাহাড় প্রমাণ বোঝা নেমে যায়। শম্বুর কথা অনুযায়ী দুর্গের দূরত্ব এখান থেকে খুব বেশি নয়। ঘণ্টা দুয়েক রাত্রি থাকতে ওরা পৌঁছে যেতে পারবে।

এখন তিনঘণ্টা খাওয়া বিশ্রাম করা চলতে পারে অনায়াসে।

আশ পাশে কোথাও শত্রুর চিহ্ন মাত্র নেই। এবার যেন সকলে বোবা মুখে ভাষা পেল। ভুজ্যু স্বয়ং বক্তা সেজে সকলকে আনন্দ দিতে লাগল। ওদিকে উটের পিঠ থেকে পান ভোজনের সামগ্রী নামিয়ে খাবার ব্যবস্থা করা হতে থাকে।

পূর্ণিমার রাত। চাঁদের কিরণ বালুর উপর এসে পড়তে আরো চিকচিক করছে। ইন্দ্রের ভজন করতে করতে সকলে ভোজনপর্ব সমাধা করল। তারপর সোম ভরা চষক হাতে নিয়ে সকলে বালুর পাহাড়ে হেলান দিয়ে পান করতে আরম্ভ করে। ভুজ্যু আগে থেকেই পান'এর মাত্রা বেঁধে দিয়েছিল, তাই বেশি পান করে কারো নেশা হবার কথা নয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ভুজ্যুর চোখে ঘুম নেই। তার মনের মধ্যে নানা চিন্তা এসে জট পাকাতে থাকে। তাছাড়া শম্বুর দিকে নজর রাখতে হচ্ছে তাকে।

ঠিক সময় মত সকলে উঠে পড়ে।

এখান থেকে সকলকে অস্ত্র-শস্ত্রে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। রাত থাকতে রাতের সুযোগ নিয়ে ওখানে পৌঁছে অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণ করতে হবে। পথপ্রদর্শক আকাশের তারা দেখে আগে আগে চলছে, পিছনে ভুজ্যুর বাহিনী। ওরা সোজা চলছিল। যদিও ঐ দিকেই তাদের যেতে হবে তবুও ভুজ্যুর যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না।

শম্বুর কথামত তিনঘণ্টা পর পশ্চিম দিকে কালো মেঘের মত সীমা দেখা গেল। আরো একটু এাগয়ে বোঝা গেল ওগুলি পাহাড়-শ্রেণী। এবার সকলের ধড়ে প্রাণ এলো। যদিও শম্বুকে কেউই

বিশ্বাস করত না, কিন্তু তাদের ব্যবহারে প্রকাশ না পেলেও শম্বুর কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না।

দুর্গের কিছুটা দূরে জিনিষপত্র ও কয়েকটি উট রেখে বাকী সকলে এগিয়ে যায়। এরা সকলেই যোদ্ধা। দুর্গের কাছাকাছি যেতে বালুর ভিতর থেকে একটা ছোট পাহাড় দেখা গেল। আরো খানিকটা যেতে দুর্গের প্রাকার দেখা গেল। এদিকের পাহাড় অনেকখানি ঢালু। এবার যোদ্ধার দল উট থেকে নেমে প্রাকারের দিকে এগিয়ে যায়।

ভুজ্যু চারিদিক ভালো করে লক্ষ্য করে আদেশ করতে যোদ্ধারা পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করে। ওদের উঠবার সময় পায়ের শব্দ হচ্ছিল কিন্তু শত্রুরা সন্দেহ করতে পারেনি যে এতখানি দুর্গম পথ অতিক্রম করে এদিক দিয়ে আর্যসেনা আসতে পারে।

কোনো এক সময়ে এই পণিদূর্গ আর্যরা দখল করেছিল। কিন্তু তারা অধিকারে রাখতে পারেনি। ইতিমধ্যে পণিরা এই দুর্গকে অনেক বেশি সুরক্ষিত করে তৈরী করেছে। তবুও এদিকটা ততখানি দৃঢ় বা দুরারোহ নয়। ভুজ্যু এবং তার সেনা ধীরে ধীরে প্রাকার পার হয়ে ভিতরে ঢুকে যায়।

দুর্গের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শত্রু সৈনিক রয়েছে। সংবাদ পেতেই তারা দৃঢ়তার সঙ্গে আর্যসেনার গতিরোধ করল। কিন্তু এই জায়গাটা এত সঙ্কীর্ণ যে শত্রু তাদের বিরাট সংখ্যা-শক্তি প্রয়োগ করতে পারছিল না

সকাল হতে দিনের আলোয় আর্যসেনা দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর। পণিসেনা এক এক আঙ্গুল জমির জন্য ভয়ানক যুদ্ধ করে চলেছে। পণিরা বর্শা এবং তরবারী দিয়ে আক্রমণ করছে আর্যদের। কিন্তু আর্যদের ক্ষিপ্রতার কাছে ওরা এঁটে উঠতে পারে না।

এক প্রহর দিন হতে হতে দস্যুরা পরাস্ত হ'ল। ভুজ্যু জানত এখানকার পণি সেনাপতির নাম। ওর ইচ্ছা ছিল তাকে জীবন্ত গ্রেপ্তার করবে কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

আর্যসেনা দুর্গের উপর উঠে তাদের উপস্থিতির সঙ্কেত করে আগুন জ্বালিয়ে। ইতিমধ্যে বাকি পণি সেনানীও পালিয়ে যেতে সফল হয়। ক্রোধে ক্ষিপ্ত আর্যসেনা দুর্গের মধ্যে ঢুকে নিরীহ পণিদের উপর তরবারী চালিয়ে প্রতিশোধ নেয়।

এমনি করে পণিদের এই অভেদ্য দুর্গ আর্যদখলে আসে।

কিন্তু এই সফলতাকে বিজয় বলা যায় না।

পণি-সেনানী এখনো অপরাজিত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের সৈন্যবল সিন্ধু উপত্যকায় বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ ওদের পিছনে তাড়া করা ছাড়া ভুজ্যুর আর কিছু করবার নেই। সময় অত্যন্ত কম। নইলে কুমকের সাহায্য পাওয়া যেত। বেগবান অশ্বারোহী দিয়ে দিবোদাসকে সফলতার সংবাদ পাঠায়। তাছাড়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের অনেকাংশ পাঠিয়ে দিয়ে ভুজ্যু আবার পণিদের পিছনে ছুটল।

লোক মারফত ভুজ্যু সংবাদ পেয়েছিল পণি সরদার নৌকায় করে পালাচ্ছে। সিন্ধু এখান থেকে তিন-চার দিনের রাস্তা হলেও এই ভুমিতে ঘোড়া চড়তে কোনো অসুবিধা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আর্য ঘোড়সওয়ার পণিদের পিছনে ছুটল।

পণিদের কাছেও ঘোড়ার অভাব ছিল না। কিন্তু সেগুলি আর্যদের ঘোড়ার মত অত উচ্চশিক্ষিত নয় এবং ওদের চালক তত চতুর নয়। ঘোড়ার খুরের দাগ ধরে আর্যসেনা এগিয়ে যায় পণিদের উদ্দেশ্যে।

সারা দস্যুদল তখনো সিন্ধুর তীরে পৌঁছতে পারেনি এমনি সময়ে আর্যসেনা তাদের পিছনে এসে পড়ল। আবার দুইদলে সঙ্ঘর্ষ হ'ল। কিন্তু পণি সরদার ততক্ষণ কিছু বিশ্বস্ত সেনাসহ নৌকায়

চেপে রওয়ানা হয়ে গেছে। এই আচমকা আক্রমণে পণিদের বহু বড় বড় মূল্যবান নৌকা নষ্ট হয়ে যায়।

আর্য অশ্বারোহী সেনা সিন্ধুর উভয় তট বরাবর ওদের পিছনে তাড়া করে চলেছে। ভুজ্যু নিজে একখানি মহানৌকায় কিছু সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়েছে এবং আরো কয়েকখানি পণি নৌকায় বহু আর্যসেনা তার পিছনে পিছনে যেতে থাকে।

এই নৌকাযাত্রা একেবারে সরাসরি হল না। কারণ পথিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জনপদের নগর-নিগম দুর্গবদ্ধ ছিল। তাদের নষ্ট না করে আগে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পণিরা একথা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। পণি-সেনানী মধ্যে মধ্যে পীতকেশীদের প্রতিরোধ করে, কিন্তু এখন থেকে ওরা অস্ত্র-শস্ত্রের শক্তির দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করবার আশা ছেড়েছিল। মায়া দিয়ে শত্রুর সর্বনাশ করবার জন্য ওরা প্রস্তুত হল।

এগুতে এগুতে আর্যসেনা সমুদ্রতটের এক পণি-নগরীতে পৌঁছল।

কয়েক পুরুষ আগে আর্যরা এই নগরী দখল করেছিল। তখন থেকে পণিরা আর্যদের কাছে বলি পাঠাতো নিয়ম মত।

পণিদের কাছে এই নগরী অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ওরা সাধারণ ব্যাপারী ছিল না। শুধু নদীপথে নয় সমুদ্রেও ওদের বিরাট বিরাট পোত থাকত এবং ওদের বাণিজ্য যাত্রা সুদূর ববেরু থেকেও আগে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাণিজ্য দ্বারা দ্বীপ দ্বীপান্তরের লক্ষ্মী এসে জড়ো হত এই নগরীতে। এখানে বিশাল বিশাল অট্টালিকা ছিল। সামুদ্রিক সার্থবাহদের বিরাট বিরাট প্রাসাদ ছিল। তাদের বৈভব তাম্রযুগের লোকের কাছে আশ্চর্যই নয় অবিশ্বাস্যও ছিল।

পণি সেনানী এখানে বড় রকমের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করল না।

শুধু কোনো প্রকারে আর্যদের ঠেকিয়ে রেখে সেই সুযোগে বড় বড় সমুদ্রগামী পোতে এখানকার ধন-রত্নাদি নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবে। কেবল ধনাঢ্য সার্থবাহ এবং তাদের পরিবারগুলি এই পোতে আশ্রয় পেল। বাকী সব পড়ে রইল।

পণিরা পীতকেশীদের কাছে দয়ার আশা করত না। এক একটি ক্ষণ অত্যন্ত মূল্যবান ওদের কাছে।

সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ হল। আর্যরা ভাবল পরদিন নিশ্চয় যুদ্ধের চেহারা আরো ভীষণ আকার ধারণ করবে।

কিন্তু না।

পরদিন আর্যরা অবাক হয়ে গেল। পণি নগরীতে কেউই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। যেখানে সেখানে রথগুলি শূন্য পড়ে আছে। বড় বড় প্রাসাদগুলি শূন্য পড়ে আছে। নগরীর একটি প্রাণীও যুদ্ধ চায় না।

আর্যরা এতবড় নগরী আগে কখনো দেখেনি। মনে হয় এটা তাম্রযুগ নয়। লৌহযুগের কোনো ভব্য নগরীতে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। বিশাল অট্টালিকার সারি দেখে ওরা আন্দাজ করতেও পারে না যে এরা কতখানি বিত্তবান। নগরীর প্রধান রাস্তা বাইশ হাত চওড়া। ছোট ছোট গলিপথগুলিও কমপক্ষে ছয়হাত চওড়া। রাস্তা এবং গলিপথ একে অপরকে সমকোণে কেটে অন্যদিকে পার হয়ে গেছে। প্রত্যেক রাস্তার ও গলির মুখে সার্বজনিক উপযোগী কূয়ো। অধিকাংশ বাড়ীতে নিজস্ব কূয়ো এবং স্নান-কোষ্ঠক রয়েছে। জল-নিষ্কাষণের জন্য নর্দমা অথবা বড় নালার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকাংশ বাড়ী পাকা ইটের তৈরী দ্বিতল, ত্রিতল। তাছাড়া ইটের জোড়া এমন সূক্ষ্ম যে তার ফাঁকে পাতলা ছুরির ফলা ঢোকানো অসম্ভব। বাড়ীগুলি যেমন সুখদ তেমনি স্বচ্ছ। যত ছোট বাড়ীই হোক না কেন দু-তিনটা কামরা নিশ্চয় রয়েছে তাতে। বড় প্রাসাদ-

গুলি দেখলে ত চক্ষুস্থির হয়ে যায়, এত বিরাটভাবে তৈরী সেগুলি। উঠানগুলিও ইঁট বিছিয়ে পাকা করা এবং প্রাচীরের গায়ে জানালার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। মুখ্যদ্বার রাস্তার দিকে খুলবার ব্যবস্থা। সেইদিকেই বাড়ীর স্নান ঘর দেখা যায় প্রায় বাড়ীতে। শুধু নিচতলায় নয় স্নানঘর উপর তলায়ও রয়েছে। পায়খানা ছাতের উপর অবস্থিত। রাস্তার উপর দীপস্তম্ভগুলি চমৎকার সাজানো। সন্ধ্যার পরেই এগুলিতে দীপ জ্বলতে থাকে।

সপ্তসিন্ধুর ভূমিতেও অনেক পণিনগরী আছে কিন্তু আর্যদের অত্যাচারে তাদের বৈভব অক্ষুন্ন থাকতে পারে না। আসলে ওদের সমৃদ্ধ থাকতে দেওয়া হয় না। তাছাড়া বৈভবশালী পণিও বাইরে তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করে না। এতে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। আর্যরা একবার খোঁজ পেলে আর তার রক্ষা নেই।

বড় বড় প্রাসাদগুলি শূন্য পড়ে আছে। তাছাড়া অন্যান্য মাঝারি বা ছোট বাড়ীগুলি একেবারে শূন্য নয়।

পীতকেশীরাও রক্তপাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হত্যার চেয়ে নগরীর সম্পত্তি লুঠ করে তাদের লাভ বেশি হয়। নগরবাসীও অহিংস এবং বংশবদ—ওরা সহায়তা করবার জন্য প্রস্তুত।

আর্য সরদার বড় বড় প্রাসাদগুলি দখল করে নেয় এবং এখানেই নগরের সমস্ত লুণ্ঠিত সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা স্তুপীকৃত করা হতে থাকে।

ভুজ্যুর দৃষ্টি ছিল পণি সেনানীর উপর। যেমন করে হোক তাকে ধরতেই হবে। নইলে তার জিদ বজায় থাকবে না।

কিন্তু শ্যামপুত্র ভুজ্যু এবার অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।

ভুজ্যুর বোঝা উচিত ছিল যে আর্যদের প্রভুত্ব স্থলভাগ শেষ হবার সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। জলভাগের প্রভু পণি। কারণ আর্যদের ঘোড়া সমুদ্রের উপর দিয়ে দৌড়তে পারবে না।

নগরের প্রতিরক্ষার ভার কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানীর উপর ছেড়ে দিয়ে ভূজ্যু অনেকগুলি বিশাল নৌকা নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে যাত্রা করল। সপ্তসিন্ধুর বিশাল নদীতে নৌকায় যাতায়াত করা অভ্যাস থাকলেও এটা সমুদ্র। সমুদ্র সম্বন্ধে ওরা একেবারেই অজ্ঞ। নদীর একটা সীমা থাকে। তার তীরে পরিচিত জায়গা অথবা চিহ্ন থাকে। কিন্তু সমুদ্রের কোন কূল কিনারা নেই। এখানে পরিচিত জায়গাও থাকে না। মহানগরে হাজার হাজার মানুষ ছিল যারা ববেরু, অসুর দেশে দু-চারবার সমুদ্রপথে যাতায়াত করেছে বা সমুদ্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু তারা শত্রুর দলের বা জাতির বলে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

তার বদলে পণি স্ত্রীর গর্ভজাত আর্য সন্তানকে বরং বিশ্বাস করা যায়। যদিও আর্য তাদের খুবই হীন দৃষ্টিতে দেখে থাকে। তবুও পণিদের সামনে ওদের খানিকটা উঁচু বলে মনে করা যায়। ওদের উপর একটু আধটু পক্ষপাতও রয়েছে আর্যদের। তারাও আর্যদের সেবা করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে। যেমন আমরা মরুভূমির পথ-প্রদর্শক শম্বুকে দেখেছি।

পণিরাও এদিক দিয়ে খুবই সতর্ক। তারা একই তরবারী দিয়ে আর্য এবং অর্দ্ধ-আর্যকে কাটতে আনন্দ অনুভব করে।

ভূজ্যুর কাছে পঞ্চাশখানারও বেশি বিশাল নৌকা ছিল। ঘোড়ার কোনো মূল্যই নেই এখানে। সমুদ্রের বুকে একমুঠো ছাতু প্রভৃতি খাবার জিনিষের দাম একতাল সোনার চেয়েও বেশি। তেমনি এক ঢোক জলের জন্যও একটি মূল্যবান প্রাণ চলে যায় বলে প্রচুর জল সঞ্চয় করে রাখতে হয়।

ভূজ্যু সমুদ্র কিনারে এসে যাত্রার জন্য তৈরী হতে বেশ খানিকটা সময় নিয়েছিল। কিন্তু পণিদের পোত আগে থেকে সবরকমে তৈরী ছিল। ভূজ্যুর সঙ্গীরা এই অজানা অভিযানের জন্য ভূজ্যুকে অনেক

নিষেধ করেছিল, কিন্তু ভুজ্যু কারো কথা শুনতে রাজী হয়নি। ও জানে ওরা এখান থেকে চলে যাবার পরদিনই পণি সেনানী এসে আবার দখল করে বসবে। তাই ওকে শেষ না করা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। আর্য অনিশ্চিত কালের জন্য এই মহানগরীতে থাকতে পারে না। তাই পণি সেনানীর পিছু নেবার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ওকে প্রস্তুত হতে হয়। ওর সঙ্গে অনেক পণি ও অর্দ্ধ-পণি পথ প্রদর্শক হয়ে যাত্রা করে ওকে সহায়তা করতে।

ভুজ্যুর পোত রওয়ানা হয়। পশ্চিমের হাওয়া অনুকূল হওয়ায় সব পোতগুলিতে পাল তুলে দেওয়া হল। এক একটি পালের পিছনে দুইজন লোক বহাল হল। তাদের একজন আর্য আর একজন অনার্য। বাতাসের ধাক্কা খেয়ে সমুদ্রের বুকে পাখীর মত উড়ে চলল ওদের পোতের সারি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্থলভূমি অদৃশ্য হয়ে গেল।

চারিদিকে শুধু জল আর জল। উপরে সীমাহীন নীলাকাশ। আর নিচের অকূল জলরাশি। ওরা ভাবে মরুভূমির কথা। সেখানেও ছিল উপরে আকাশ আর নিচেয় অখণ্ড বালুকারাশি। তবুও সেখানকার বর্ণনা কিছু ভিন্ন ছিল। আর এখানে পোতের মধ্যে যা কিছু ভিন্ন, বাকী সব একাকার।

পোত চলছে ত চলছে। ভরসা শুধু পথ-প্রদর্শকের সান্ত্বনা। তারা যা বলছে তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য।

এমনি ভাবে চলল এক দিন এক রাত। তার পরদিন দুপুরবেলা সকলে দূরে দিগন্তের কাছাকাছি পণিদের পোত দেখতে পেল। ভুজ্যুর হৃদয় আশায় ভরে উঠল। এবার পণি সেনানীকে জীবিত বা মৃত তার হাতে আসতেই হবে।

কিন্তু সব বৃথা।

কাছাকাছি এসে যে পোতগুলি ওরা ঘেরাও করল সেগুলি পণি সার্থবাহদের বাণিজ্যপোত।

সেনা এবং সেনানী হাতছাড়া হয়ে গেছে। পোতগুলি মহার্ঘ রত্ন সামগ্রীতে ভর্তি।

এখন এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব তাদের সব অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী কেড়ে নিয়ে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই বাতাস প্রতিকূল হয়ে উঠল।

সমুদ্র গর্জন করে উঠল ভয়ঙ্কর আক্রোশে। তালগাছ সমান একের পর এক ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল ওদের পোতের গায়ে। কলার ভেলার মত পোতগুলি একবার আকাশের দিকে উঠে আবার আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। পোতের ভিতরে যারা ছিল তারা সকলে প্রমাদ গণল। এবার বুঝি আর রক্ষা নেই। এই বুঝি মহাপ্রলয় শুরু হল। সমুদ্রের আক্রোশ থেকে আর জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

সকলে করযোড়ে বরুণদেবের স্তুতি করতে লাগল।

কিন্তু বরুণদেবের আজ্ঞা মানতে সমুদ্র রাজী নয়।

বিপদের উপর আবার বিপদ। সন্ধ্যা তখন ঘোর হয়ে এসেছে। মেঘের আড়ালে তারা সব ঢাকা পড়ে যেতে পথপ্রদর্শক দিশাহারা হয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সকলেই সশঙ্কিত। যে কোনো মুহূর্তে পোত সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ওরা কোনদিকে চলেছে তার ঠিকানা নেই।

তীরের বেগে পোতগুলি ছুটে চলেছে অজানা পথে।

পথ প্রদর্শক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঈশ্বরের নাম জপ করছে।

পোতের ভিতরে আরও বিপদ। পীতকেশীরা সকলে বমি করতে

করতে আধমরা হয়ে পড়েছে। ভুজ্যু এবং তার অন্য সাথীরা যদিও বমি করেনি তবুও কিছু খেতে সাহস হয় না ওদের।

তৃতীয় দিনে সমুদ্র শান্ত হ'ল। পীতকেশী সকলে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং অন্ন মুখে দিয়েছে। এবার সকলের মুখে কথা বেরোয়। সকলে বরুণদেবের স্তুতি করে।

"হে সহস্রনেত্র শুভ্র বরুণদেব। তুমিই বিশাল সমুদ্র ও পৃথিবীময় ব্যপ্ত হয়ে আছ। তুমি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ো না। আমরা কি এমন পাপ করেছি যে আমাদের প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছ!"

হয়ত ওরা সত্যিই পাপ করেছে। পীতকেশীরা ইন্দ্রকেই সর্বেসর্বা বলে মানত। বিপদে না পড়লে বরুণকে কেউ স্মরণ করে না। এখানেও নিরাশ হয়ে ভুজ্যু দুই অশ্বিনীর কাছে প্রার্থনা করেছিল।

তৃতীয় দিন ও রাত তেমনি আশা নিরাশার মধ্যে কাটল। চতুর্থ দিন সকালে উষা বন্দনার শেষে ভুজ্যু চারিদিকে ভালো করে নজর করে সমুদ্রতট দেখতে পেল। সকলের মনে আবার নতুন আশার সঞ্চার হয়। আবার তারা ধরিত্রী মায়ের কোলে ফিরে যাবে।

আরো খানিকক্ষণ পর ওদের শতপাল পোত তটের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর একে একে অন্য পোতগুলিও এসে পড়ল। সকলে এসে জমা হলে ছোট নৌকার সাহায্যে ভুজ্যু কিছু সৈনিক নিয়ে তীরে উঠে আসে।

তীর থেকে অল্পদূরে লোকজনের সন্ধান পাওয়া গেল। এখানে ওরা মহানগর থেকে পাঁচ দিনের রাস্তা দূরে এসে পড়েছে। এই কটা দিন মাটির স্পর্শ না পেয়ে সকলে নিজেদের অনাথ মনে করছিল। এবার মাটির স্পর্শ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

এ দেশের নাম অমিত্র।

ভুজ্যু প্রথম কয়েকদিন এখানকার খবরাখবর নিয়ে তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঘোড়া না থাকলেও ওর সঙ্গে যথেষ্ট সৈন্য ছিল যারা নিজেদের তরবারীকে বিশ্বাস করতে পারত।

সমুদ্রতট বিজয় করে ভুজ্যুর বাহিনী এবার উত্তর দিকে রওয়ানা হয়।

এই চলার পথের দিনগুলি নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কাটলেও সকল জায়গায় ওরা জয়ের মুকুট পেয়ে এগিয়ে চলেছিল।

তারপর একদিন পরুষ্ণীর তীরে ভরত জন-এর সীমানায় পৌঁছলে ভরত রাজা এবং ভরতজন এসে বিজয়িনী বাহিনীকে প্রাণখোলা স্বাগত জানায়।

## ॥ আট ॥

### "দিবোদাসাদতিথিগ্বস্য রাধঃ"

[ ঋক—৬।৪৭।২২ ]

বিয়াস ও পরুষ্ণী নদীর মধ্যকার বিরাট ভূখণ্ডের তৃৎসুজন'এর রাজা দিবোদাস এখন শুধু তৃৎসুজনের রাজা নয়। ধীরে ধীরে তার বিজয়ী হাত সমগ্র সপ্তসিন্ধুর উপর বিস্তৃত হতে থাকে। তাছাড়া ভুজ্যুর মহান বিজয় সমুদ্র পথেও বহুজনপদ জয় করে দিবোদাসের রাজ্যের সীমানা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

পণি এখন সম্পূর্ণভাবে আর্যদের সামনে মাথা নত করেছে।

কিন্তু কিলাত জাতি এখনও মাথা নিচু করেনি। কিলাতদের বশ্যতা স্বীকার করানো ততখানি সহজ হবে না তা আর্যরা জানত।

আর্যদের মধ্যেও বহু বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

কয়লার মত কালো নিষাদ জাতির সঙ্গে কালেভদ্রে কখনো যুদ্ধ করতে হত। গ্রাম ও নগর নিবাসী পণির বিরুদ্ধে এবার শেষ সংগ্রাম হয়ে গেছে। কিন্তু পাহাড়ী কিলাতদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সঙ্ঘর্ষ লেগেই থাকত।

ভরদ্বাজ ঋষি জানতেন যদি সমগ্র আর্যজাতি একতাবদ্ধ হয়ে কিলাত দমন করতে চেষ্টা না করে তাহলে কিলাত জাতিকে দমন করা সহজ হবে না।

আর্যজাতির পঞ্চবর্ণের একবর্ণ পুরু জনের এক শাখা তৃৎসু-ভর্রত এসময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু পরুষ্ণী, শতদ্রু'র তীরবর্তী জাতি যদু ও তুর্বশদের সপ্তসিন্ধুর তৃৎসুদের উপর ভীষণ হিংসা ছিল। যেহেতু বধ্রযশ্বকে যেমন সকল জাতি

শ্রদ্ধাভক্তি করত, তার মৃত্যুর পর পুত্র দিবোদাসকেও সকলে শ্রেষ্ঠ বলে মানতে লাগল।

ঋষি ভরদ্বাজ বহুচেষ্টা করে এই তুর্বশ-যদু জাতিকে বশ মানাতে সমর্থ হলেন। সকলে দিবোদাসকে তাদের প্রধান বলে মেনে নেয়।

দিবোদাস রাজা হয়ে কেবল তার নিজভূমি তৃৎসুভূমিকেই স্বর্গের মত তৈরী করেনি, সমগ্র সপ্তসিন্ধুর চেহারা বদলে দিয়েছে।

প্রত্যেক বড় বড় রাস্তায় প্রতি দুই যোজন পর একটি করে আবসথ বা বস্তী পত্তন করে দিয়েছে। প্রত্যেক বস্তীতে গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি অজস্র পশুর ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলিকে চরাবার জন্য পশুপালক এবং পশুপালকদের থাকবার জন্য উপযুক্ত থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পথচারী যে কেউ এদিক দিয়ে যাবে এখানে বিশ্রাম করতেই হবে তাকে। তাদের সঙ্গে যদি পশু থাকে তাহলে সেগুলিরও উপযুক্ত থাকা ও খাবার ব্যবস্থা রয়েছে। দিনের বেলা দুধ, দই, ক্ষীর আর ছাতু দিয়ে অতিথি সেবার ব্যবস্থা; আর রাত্রে প্রতিদিনই প্রচুর মাংস এবং সুপ-এর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তাছাড়া সোম ও সুরার ব্যবস্থা রয়েছে। যার যেমন রুচি সে তেমন পানীয় গ্রহণ করে।

কয়েক বৎসরের চেষ্টার পর জানা গেল প্রতিদিন কতগুলি গরু প্রয়োজন। তখন থেকে সেই সংখ্যক গরুকে একজায়গায় জড়ো করে তাদের মাংস আর চামড়া ছাড়িয়ে একসঙ্গে বড় বড় তামার পাত্রে সিদ্ধ করা হত। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন অতিথিশালায় সূপকারদের অসুবিধায় পড়তে হত না; অথবা রাজর্ষি রন্তিদেব-এর সূপকারদের মত বলতে হত না—"সূপং ভূমিষ্ঠং মশ্নীধ্ব নাম মাংসং যথা পুরা"।

আবসথাগার বা অতিথিশালাগুলি রাজপথের উপর সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। এর আশপাশে নানাপ্রকার ফল ও ফুলের গাছ

এক এক ঋতুতে এক এক রূপ ধারণ করে চোখকে তৃপ্তি দিত। বড় বড় গাছের চারিদিকে গরু-বাছুর চরে বেড়াত। কিছু দূরে দূরে গাছতলায় পথিকের বসবাস বা বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা। কোনোদিকেই কোনো ত্রুটি নেই।

অতিথিশালার পরিচারক পরিচারিকারা প্রায়ই নিষাদ জাতির হ'ত। এদের থাকার জন্য স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতিথিশালা কখনো শূন্য হত না। এই অতিথিশালা রূপ বস্তীর মুখ্যপদের অধিকারী একমাত্র আর্যরাই হতে পারে। তার কারণ আর্যদের শিষ্টাচার নির্বাহ করতে আর্যই উপযুক্ত বা সমর্থ।

তাছাড়া এই আবসথ গোত্রের ভিন্ন একটা নামও রাখা হয়েছিল।

দিবোদাস অবশ্য এর তেমন পক্ষপাত করত না কিন্তু ঋষি ভরদ্বাজ দিবোদাসের নিষেধ সত্বেও আবসথ গোত্রের নামকরণ করলেন।

ঋষি ভরদ্বাজ যদু ও তুর্বশ কুলের ঘরে ঘরে নিজের শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের বোঝাতে লাগলেন যে ইন্দ্র দিবোদাসকে গোত্রবধ করবার জন্য পাঠাননি, তিনি তাঁর ভক্ত আর্যজাতির উন্নতির জন্য দিবোদাসকে ধরাতলে পাঠিয়েছেন।

বৎসরের পর বৎসর এমনি পরিশ্রম করে ঋষি তাঁর কাজে সাফল্যলাভ করলেন।

ধীরে ধীরে সমগ্র সপ্তসিন্ধু শান্ত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

সপ্তসিন্ধুর ঘরে ঘরে প্রতিদিন প্রাতঃ-সন্ধ্যা ভগবত আরাধনার সময় স্বাহাকার রব গুঞ্জন করত। ঘৃত-মিশ্রিত ধান্যের সুগন্ধে দিঙমণ্ডল ধূমিল ও সুগন্ধিতে ভরে যেতে। প্রতিটি পরিবার এত ধন ( পশু ) ধান্যে পরিপূর্ণ থাকত যে কখনো কোনো অতিথি নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি।

সত্যি সত্যিই সপ্তসিন্ধুতে দুধ দইয়ের নদী বয়ে যেত। অবশ্য

সে নদী আর্যদের জন্যেই বইত। তাই বলে আবাসথ গৃহে কোনো আর্য-ভিন্ন জাতি গিয়ে অনাহারে থাকেনি।

সেবার গ্রীষ্মকালে গরমটা অন্যবারের চেয়ে একটু বেশিই পড়েছিল। দুপুরে রৌদ্রের খরতাপে রাস্তাঘাটে মানুষ খুব কমই দেখা যেত। নেহাত দরকার ছাড়া কেউ ঘর ছেড়ে বের হত না।

রাস্তার মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের ছায়ায় পশুপালকরা সারা দুপুর বিশ্রাম করত। পশুগুলিও এ সময় বিশ্রাম করত।

সেদিন তুগ্র এবং তার স্ত্রী—দুই তরুণ আর্য পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার পাশে একটা বুনো আমগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করবার জন্য বসে পড়ল। এই গাছের পাশেই একটা কাঁচা কুঁয়ো ছিল। ওরা মনে মনে ঠিক করল আজ রাতটা এই গাছের শীতল ছায়ায় কাটিয়ে দেবে। ক্লান্ত দম্পতি গাছের নিচেকার ঝরা পাতাগুলি পরিষ্কার করে বসবার ব্যবস্থা করছে এমন সময় তাদের গন্তব্য দিক থেকে অন্য একজন যাত্রী এসে বলল,—না আর্য! এখানে বিশ্রাম করবার দরকার নেই। আবসথ কাছেই।

—কিন্তু আমরা বড়ই পরিশ্রান্ত, আমাদের খাবার ইচ্ছে নেই। বলল যাত্রী।

—খিদে না থাকলে পিপাসা ত নিশ্চয় আছে। ওখানে মধুমিশ্রিত সোম পাওয়া যাবে। এই গ্রীষ্মের আর পথচলার শ্রান্তি দূর করে দেবে এক মুহূর্তে। যত প্রাণ চায় খাও।

আর্য দম্পতির এই গাছতলায় রাতের পর রাত কাটাতে ভয় পাবার কথা নয়। একে ত দুজনেই যৌবনের উত্তুঙ্গ বলে বলীয়ান, তারপর কিলাত গ্রাম এখান থেকে বহু দূরে। অতএব ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু নবাগত যাত্রীর অনুরোধে অনিচ্ছা সত্বেও ওরা আবাসথে গিয়ে উঠল।

আবাসথিক বা অতিথিশালার প্রধান ওদের জন্য একটি পৃথক ঘর খুলে দেয়। তুগ্র আর রোহিনী ঘরে গিয়ে চামড়ার দ্রাপি খুলে বসে একটু বিশ্রাম নেয়। দ্রাপি খুলতে ওদের গৌরবর্ণ দেহ লাল হয়ে উঠল। সোনালী রঙের লম্বা লম্বা চুলগুলি কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়ে যৌবনের তেজোময় রূপ শত-সহস্রগুণে বৃদ্ধি করেছে।

আবাসথিক ওদের পরিশ্রান্ত দেখে অত্যন্ত নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে সুবর্ণ বর্ণ সোমের সঙ্গে মধু আর দুধ মিলিয়ে বড় চষকে করে সামনে এনে দেয়। এই সময়ে এর চেয়ে বড় লোভনীয় বা সুস্বাদু পানীয় দুনিয়ায় আর হতে পারে না। একনিশ্বাসে চষক খালি করে পাশে রাখতে হঠাৎ স্মৃতিপটে যেন কিছু ভেসে ওঠে। তুগ্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে,—"ইন্দ্রায় অয়ম"।

—অনেক দূর থেকে আসছেন বোধ হয় আর্য? প্রশ্ন করে আবসথিক।

—খুব বেশি দূর নয় ভাই, মাত্র চার-পাঁচ দিনের পথ সৃঞ্জয়-দের দেশ থেকে। কিন্তু এবার যা গরম পড়েছে......।

—গরমের দিনে যাত্রা সত্যিই কঠিন। তাছাড়া শীতের সময়েও আবার গায়ে দেবার জন্য কম্বল প্রভৃতি পোষাকের ভারী বোঝা নিয়ে পথ চলতেও কম অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। কিন্তু মহামান্য ঋষির প্রতাপে প্রত্যেক আবসথে পর্যাপ্ত পরিমাণে কম্বল মজুদ থাকে। ভয় শুধু বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজবার।

—গ্রীষ্মকালও যাত্রার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তবুও আমরা এই সময়েই বেরিয়ে পড়েছি।

—কোনো বিশেষ জরুরী কাজ ছিল বোধ হয়?

—জরুরী কাজ ত প্রতি আর্যসন্তানের জানা আছে। বধ্রযশ্ব-পুত্র আর ঋষি ভরদ্বাজ আমাদের জন্য আমাদের কাজের চিন্তা করবার

অবসর দেননি। সকলের কাজ সকলের জানা আছে এমনই অপূর্ব ব্যবস্থা।

ওদের কথা শুনে একজন অর্দ্ধ আর্য ( নিষাদ স্ত্রী ও আর্য পুরুষের মিলিত সন্তান ) বলল,—আর্য ত ঘোড়ায় চেপে আসতে পারতেন।

—পারতাম, কিন্তু এমনি একটু কষ্ট করে আমরা আমাদের শরীরকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে ইচ্ছা করেছি। তাছাড়া দিবোদাস এমনি কষ্টসহিষ্ণুদের খুব পছন্দ করেন।

—হ্যাঁ, তিনি শৈশব থেকেই ভয়ানক পরিশ্রমী ছিলেন। নাবালক বয়সেই অশ্বসমন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে অশ্বারোহনের শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাছাড়া পায়ে হেঁটেও দু-একশ যোজন যাত্রা করতেও তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত নন।

—হ্যাঁ, দিবোদাস রাজা বলেন আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হ'ল কিলাত। তাদের নিবাসভূমি আমাদের এখানকার মত সমতল ভূমিতে নয়। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় থেকেই ওরা এখনও আমাদের কাছে অপরাজিত রয়ে গেছে। ওখানে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা অসম্ভব বলে আমাদের সকল তরুণদের কিলাতের মত পাহাড়ীবিদ্যা শিখতে হবে।

—আর্য এবং আর্যাকে এসময়ে রাজা দিবোদাস যদি দেখতেন তাহলে তিনি খুব খুশী হতেন। বলল অর্দ্ধ আর্য পরিচারক।

ওদের এই কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট ধারনা করে নেওয়া যায় যে রাজা দিবোদাস ও ঋষি ভরদ্বাজ আর্যভূমিকে কতখানি সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন করে গড়ে তুলেছিলেন, এবং দেশের তরুণ-তরুণীদের কতখানি পরিশ্রমী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

*　　　*　　　*

স্বরস্বতী তটবর্তী এলাকা থেকে শুরু করে শতদ্রু এলাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সমস্ত আর্য জন-এর মধ্যে দুটি জিনিষ একসমান ছিল।

প্রথমত এই সব আর্যরা সকলেই ধন-ধান্যে সু-সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয়ত রাজা দিবোদাসের এবং ঋষি ভরদ্বাজের প্রতিটি ইচ্ছাকে এরা সকলেই নিজেদের সঙ্কল্প বলে মনে করত।

ঘোড়া এবং গরু পালনের মাধ্যমে তারা শিখেছে, ভালো মাতা-পিতার সন্তানও ভালো হবে।

কম্বোজ দেশীয় ঘোড়ার এদেশীয় সন্তান তাদের পিতার মতই স্বভাব পেয়েছে। ঘোড়ার জন্য যেমন প্রতিচী (পশ্চিম) দেশ বিখ্যাত ছিল, তেমনি গাই এবং বৃষভের জন্য স্বরস্বতী তটবর্তী অঞ্চল সুবিখ্যাত ছিল। সপ্তসিন্ধুর প্রায় সকল জায়গাতেই স্বরস্বতী তীরের এই ঘড়া ঘড়া দুধওয়ালা গাই দেখা যায়।

এমনি দেশে তুগ্র দম্পত্তির মত কর্মঠ তরুণের অভাব হয় না। এমনি তরুণদের দিবোদাস খুব স্নেহের চোখে দেখত এবং এরা রাজার কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মান পেত।

প্রতি বৎসরই ওদের সঙ্গে কিলাতদের যুদ্ধ হ'ত। এমনি করে কিলাতরাও যুদ্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ওদের চলমান পুরী এখন আর শুধু শীতকালেই তরাই অঞ্চলে বসত না। কখনো কখনো তরাই থেকে বেশ খানিক উচুতে যেখানে শীতের প্রকোপ কম সেখানে বাস করতে লাগল। বেশি উচুতে শুধু বরফের জন্য ওরা বারোমাস কাটাতে পারত না, কারণ সেখানে অত্যধিক বরফপাত হয় বলে ঘাসের অভাব। ঘাস কম থাকলে পশু পালন চলে না। তাই বাধ্য হয় ওরা দু-তিনমাস তরাইতে নেমে আসতে।

তুগ্র দম্পতি অতিথিশালা থেকে বিদায় নিয়ে যথাসম্ভব শীগগীর দিবোদাসের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হয়।

শিবির বলতে বস্তুতঃ পর্ণকুটির।

মানুষ, এবং গরু, ঘোড়া ও অন্যান্য পশুদের জন্য পৃথক পৃথক

বহু পর্ণকুটির তৈরী হয়েছে। তবে অতিথিদের জন্য নির্মিত কুটিরগুলি বিশেষ ভাবে সুন্দর করে ও সুখপ্রদ করে তৈরী।

দশহাজার মানুষের বাসের ব্যবস্থা যেখানে সেখানে পর্ণকুটির নগর বলা যায় অনায়াসে। এখানে দিবোদাসের নিজের অতিথিশালা রয়েছে। তুগ্র দম্পতিকে একটি ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে পরিচারক তখুনিই রাজাকে সংবাদ দেয়।

রাজা দিবোদাস ছুটে এসে দুজনের মাথায় আঘ্রাণ নিয়ে বললেন,

—বৎস! আমি অনুভব করতে পারছি তোমরা এই দারুণ গরমে কি ভয়ানক কষ্ট স্বীকার করে এতদূর এসেছ।

—না আর্য! এ আর এমন কি কষ্ট। আপনার এবং ঋষির চরণ দর্শন করতেই আমাদের সব পথক্লেশ দূর হয়ে গেছে।

দম্পতির সঙ্গে আলাপ করে দিবোদাস বুঝতে পারে ওরা সৃঞ্জয় দেশ থেকে এসেছে। দিবোদাস অত্যন্ত আপনভাবে প্রশ্ন করে,---তারপর তোমার জনপদের সব কুশল ত?

—হ্যাঁ আর্য, আপাতত কুশল। সৃঞ্জয় জনপদ থেকে কিলাত ভূমি মাত্র কয়েকদিনের পথ। প্রতিবৎসর আমাদের কিলাতীয় অত্যাচার সহ্য করতে হয়। পণিরা একসময় খুব অনাচার অত্যাচার করলেও এখন আর ওদের ভয় নেই।

—জানি, পণিরা এখন আর ততখানি ভয়ঙ্কর নয়। আমাদের মনু প্রভৃতি পিতৃপুরুষদের কৃপায় সে ভয় অনেকাংশে দূর হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর্যদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু হ'ল ( কিরাত ) কিলাত। যতক্ষণ ওদের সম্পূর্ণ দমন করতে না পারা যাচ্ছে ততক্ষণ আর্যজাতি নির্ভয় হতে পারছে না।

—জানি আর্য! আপনার সেই বিষয়ে প্রয়াস প্রায় সারা সপ্তসিন্ধুর লোকে জানে। তাতে অংশগ্রহণ করবার জন্য আমি

আসছিলাম, কিন্তু আমার নবপরিণীতা রোহিনীও জোর করে আমার সঙ্গে চলে এসেছে।

—বৎস! সেই জন্যেই ত আমি ইন্দ্রের বাণী বিশ্বাস করি, কিলাত অজেয় নয়। আজ অথবা কাল যেদিন সমস্ত সপ্তসিন্ধু তাদের শত্রু সম্বন্ধে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হবে সেদিন কিলাত পরাজিত হতে বাধ্য।

—ইন্দ্রের শত্রু হয়ে কেউ অজেয় থাকতে পারে না।

—হ্যাঁ। ইন্দ্র তোমাদের মত সন্তান জন্ম দিয়েছেন তাঁরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে।

—অবশ্য আর্য! ঋষির বাণী আর ইন্দ্রের প্রতিজ্ঞা কখনো বিফল হতে পারে না। আমরা সেই মহাযজ্ঞে দুটি ছোট আহুতি হয়ে এসেছি, আমাদের স্বীকার করে কৃতার্থ করুন।

—আমি সানন্দে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। দিবোদাস তরুণকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে,—এখানে তুমি তোমার মত বহু তরুণকে দেখতে পাবে যারা সুদূর গান্ধার, কম্বোজ ও কুশিক জনপদ থেকে এসেছে। যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে সংবাদ দিতে ভুলো না। ইন্দ্র তোমাদের মঙ্গল করুন। পুনর্দর্শনায়।

দিবোদাস চলে যায়। ভৃগু আর রোহিণী তার যাবার পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

তৃৎসুভূমি আর্য সৈনিকদের ছাউনিতে ভরে গেছে।

সপ্তসিন্ধুর সকল জনপদ থেকে বাছাই করা তরুণ যোদ্ধা স্ব-ইচ্ছায় দস্যুদের কবল থেকে তাদের ভূমিকে মুক্ত করবার সংগ্রামে যোগ দিতে এসেছে।

ঋষি ভরদ্বাজের মমতাপূর্ণ ব্যবহারে আজ আর কেউ কারো দিকে ঈর্ষার চোখে দেখে না। পরুষ্ণী, বিপাস, শতদ্রুর বিশাল তটভূমি নরবৃন্দ, গোবৃন্দ আর অশ্ববৃন্দের নিবাসস্থল হয়ে গেছে। বর্ষার

সময়ে এই অস্থায়ী গ্রামগুলি নদীতট থেকে খানিকটা দূরে সরে যেত। জল কমে গেলে আবার নদীর তীরে ফিরে আসত।

যদিও সপ্তসিন্ধুর প্রত্যেক জনপদে এমনি সৈনিকশিক্ষা শিবির রয়েছে, তবুও তৃৎসুভূমি সকল জন-এর মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

দিবোদাস স্বয়ং এই শিক্ষাশিবিরে গদাযুদ্ধ, ধনুর্যুদ্ধ এবং শারীরিক ব্যায়ামের কৌশল দেখাত। এইখানেই সেই রোগা ছিপছিপে শরীরের অধিকারী ঋষি ভরদ্বাজ-এর মুখনিসৃত গম্ভীর বাণী দেববাণীর মত কাজ করত। এই বাণীর অধিকাংশই ইন্দ্রের সঙ্কল্প এবং আর্য শত্রুর পরাজয়ের নিশ্চিন্ততা সম্বন্ধে বলা হ'ত। তাছাড়াও ঋষি বলতেন,—সপ্তসিন্ধুর যে কোনো জায়গায় অনাহার অথবা শত্রুভয়ের দুঃখ সারা আর্যজাতির পক্ষে বিপদজনক। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় তাকে দূর করা সম্ভব।

ঋষি বলতেন,—একটা হাত সে যত বলবানই হোক না কেন একটা ছোট কুঁড়েঘরকে তুলতে পারে না। কিন্তু একশ হাত যদি একসঙ্গে চেষ্টা করে তাহলে বিরাট বড় কুটিরও তৃণের মত হাল্কা মনে হবে। সপ্তসিন্ধুতে কোনো আর্য নির্ধন থাকতে পারে না, যাদের হাজার হাজার গরু রয়েছে তারা যদি প্রত্যেকে একটা গরু তার গরীব ভাইকে দান করে তাহলে যার কিছুই নেই সেও এক সহস্র পশুর মালিক হয়ে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারবে। তাহলে একজনের দুঃখ দেখে অপরকে মনোকষ্ট ভোগ করতে হবে না।

তোমরা অবশ্য স্মরণ রাখবে, ইন্দ্র আমাদের তখনই সহায়ক হবেন যখন আমরা সকলে একই পরিবারের মত হতে পারব। ইন্দ্রের ইচ্ছা আমরা যেন সবকিছুতেই সকলে সকলের সমান ভাগীদার হয়ে থাকি। তাঁর ইচ্ছা অবহেলা করার অর্থ নিজ নিজ স্বার্থের সন্ধান।

ঋষি ভরদ্বাজের উপদেশ প্রত্যেক হাতকে কার্যপরায়ণ করে গড়ে

তোলে এবং স্বার্থের মর্যাদা রক্ষা করতে বাধ্য হয়। পরুষ্ণীর তীরের সৈনিক শিবিরের শিক্ষায় অভ্যস্ত আর্য প্রতিবৎসর পাহাড়ে গিয়ে সক্রিয় যুদ্ধে যোগদান করে এবং সেই সব বীরগাথা প্রতিবৎসর নতুন নতুন সুরে, ছন্দে সপ্তসিন্ধুর ঘরে ঘরে শোনা যায়।

এই শিক্ষাগারের সঙ্গে হাজার হাজার কর্মকার দিনরাত অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করছে। বাণ, নিষঙ্গ ( তর্কশ ), ধনুক, জ্যা ( প্রত্যঞ্চা ), বর্ম, পরশু, বাসী, ঋষ্টি, বজ্র, অষ্টা এবং ক্ষোত্র এ সব তামা নয়ত পাথরের তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হত। প্রত্যেক সেনাকে এই সকল শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে শিক্ষালয়ে।

আর্যদের মধ্যে এই সময়ে তামার ব্যবহার খুব বেড়ে যায়। তবুও দু-একটা অস্ত্র যা সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে না যায়, পাথরের তৈরী হত। এগুলির মধ্যে কঠিন পাথরের বজ্র সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল। শক্তিশালী যোদ্ধা একটিমাত্র বজ্রের আঘাতে শত্রুর মাথা টুকরো টুকরো করে দিত। প্রাণনাশ করতে বজ্র অসির চেয়ে কম ছিল না।

সপ্তসিন্ধুর আর্যজাতি সুখী ও সমৃদ্ধ কতখানি হয়েছিল প্রতিবৎসর শীতের সময় কিলাতরা তার প্রমাণ পেত। কিলাতদের পশুপালকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না কিন্তু আর্যদের দেখাদেখি ওরাও পশুসংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগল। তবে পশুপালনের জীবনের সঙ্গে ওরা আর্যদের মত মিশতে পারেনি কখনো।

জঙ্গলের ফলের উপরই ওরা বেশি ভরসা করত। যতক্ষণ সম্ভব হত তাজা ফল খেত, তাছাড়া ফল শুকিয়ে রাখত অসময়ের জন্য।

কিলাত স্ত্রীরা খাদ্য সামগ্রী জোগাড় করতে যেমন পুরুষদের সবচেয়ে বড় সহায়ক ছিল তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রেও পুরুষের সঙ্গে সমান সমান যুদ্ধ করতে পারত।

## ॥ নয় ॥

**স্ত্রীয়ো হি দাস আয়ুধানী চক্রে।**
**কি মা করন্নবলা অস্য সেনা॥**

[ ঋক ৫।৩০।৯ ]

আর্যদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল ঘোড়া। দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে ওরা চার ঘণ্টায় ষাট যোজন ( একশ কুড়ি মাইল ) দূরের রাস্তা অনায়াসে চলে যেত।

এতদিন কিলাতদের সঙ্গে ঘোড়ার পরিচয় ছিল না কিন্তু ঘোড়া কতখানি প্রয়োজনীয় তা তারা জানত। ধীরে ধীরে ঘোড়ার ব্যবহার শিখতে লাগল কিলাতরা। কিন্তু পাহাড়ে চলবার উপযোগী ছোট ঘোড়ার পত্তন করতে পারল না। বড় ঘোড়া পাহাড়ী এলাকায় অনায়াসে চলতে পারে না এবং ছুটতে গেলে সর্বদাই পড়ে যাবার ভয় থাকে।

অগত্যা ঘোড়ার কাজ বেশিরভাগ ওরা ওদের নিশাচরী গুণের দ্বারা সম্পন্ন করত। রাত্রের অন্ধকারে দৌড়ে ৪০।৫০ মাইল রাস্তা যাওয়া আসা করা ওদের কাছে তেমনি সহজ ছিল যেমন আর্য ঘোড়ার পিঠে পঞ্চাশ যোজন ঘুরে আসত। পাহাড়ী এলাকা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী আর্যগ্রামকে রাতের অন্ধকারে এসে লুঠ করে আবার ফিরে যাওয়া মোটেই মুস্কিলের নয়।

এদিকে আর্য ওদের কাছে নাবালক। তাই নিশাচর কথাটাকেই আর্যরা পাপ বলে প্রচার করেছে। তাছাড়া ওদের সেনাদলকে আর্যরা অবলা-সেনাদল ( অবলা—বাকহীন ) বলে ঘৃণা করত।

আর্যরা বলত,—দাসরা স্ত্রীদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে বলে ওদের ভয় করবার কিছু নেই।

কিন্তু আর্যরা ওদের যেমন অবলা বলত বস্তুতঃ ওরা তেমন অবলা ছিল না। একথা মনে মনে ওরা স্বীকার করত।

শম্বর দুহিতা শম্ভু এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শম্বর যেমন লোকের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করত, তার মেয়ে শম্ভুও পিতার চেয়ে কম যেত না।

একদিন শম্ভুর সেনাদল সারারাত ধরে আর্যগ্রামের সীমানায় পৌঁছল। যদিও তখনো সকাল হয়নি কিন্তু কুকুরের চীৎকারে আর্যপুরুষরা জেগে ওঠে। আর্যদের তৈরী হয়ে আসার আগেই কুকুরের দল কিলাতদের আক্রমণ করল। কিন্তু দু-চারটি মোটা মোটা বজ্রের আঘাত খেয়েই কুকুরের দল প্রাণ নিয়ে পালায়। ততক্ষণে আর্যদল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে পৌঁছয়।

আর্য বা কিলাত কেউ কারো ভাষা বোঝে না। কিন্তু হর্ষ বা ক্রোধ প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ ভাষার প্রয়োজন হয় না। শম্ভুর কঠোর চীৎকারে আর্যরা বুঝতে পারে কোনো দস্যু স্ত্রী কথা বলছে। শব্দ এবং স্বর ভয়ানক গম্ভীর কিন্তু তার চেয়েও কঠোর তার গদার প্রহার। একের পর এক আর্য মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে। শম্ভুর হাতের বিশাল বজ্র এবং তার আঘাতের প্রচণ্ডতায় সহজে বোঝা যায় তার হাতে কতখানি শক্তি।

অবলা সেনার মতলব এক মুহূর্তে প্রকাশ পায়। তাদের লম্বা লম্বা চুল জটার মত কাঁধের দুই দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোমরের নিচেয় ছোট এক টুকরো চামড়ার অন্তর্বাসক ছাড়া বাকী সমস্ত শরীর নগ্ন। ওরা কালো নয়, হাল্কা পাণ্ডুবর্ণ ওদের দেহের রং। দেহগুলি যেন মাটির ছাঁচায় তৈরী। সব মিলিয়ে সুন্দর ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

ওদের ছোট এবং চ্যাপ্টা নাক দেখে আর্যরা ঘৃণাকরে অণাস-

খনাস বলত। কিন্তু আর্যদের লম্বা নাক দেখেও ওরা লম্বানাসা, অশ্বনাসা বলতে ছাড়ত না।

সূর্য উদয় হতে হতে অবলা সেনা সবল প্রমাণিত হয়। শম্ভুর দল আর্যদলকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে। শম্ভু তার বাহিনী নিয়ে আর্যগ্রামের মধ্যে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য আর কেউ বাকী আছে কিনা। একটি ঘরের কোণে চার বর্ষীয় একটা বালককে ভয়ে কুঁচকে জড়সড় হয়ে বসে থাকতে দেখে শম্ভু দাঁড়ায়। বালকের ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি শম্ভুর দিকে। শম্ভু এগিয়ে যেতেই বালকের মুখ দিয়ে চীৎকার বেরিয়ে আসে,—অম্বপাহি। শম্ভু সামান্য কিছু আর্যভাষা জানা অনুচরকে ডেকে প্রশ্ন করে বালকটি কি বলছে। অনুচর বলে,—ও বলছে, মা বাঁচাও।

আর্যদের উপর ভীষণ ঘৃণা থাকা সত্বেও সে সময় শম্ভুর মনের মধ্যে এক বিচিত্র ভাব লক্ষ্য করে সকলে। শম্ভু হাতের অস্ত্র একদিকে ফেলে রেখে বালককে কোলে তুলে চুম্বন করে তার পিঠ চাপড়ে অভয় দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করে।

বালক আবার চীৎকার করে উঠে।

শম্ভুকে তার অনুচর বুঝিয়ে দেয় বালকটি ভীষণ ভয় পেয়েছে। আবার হয়ত কোনো নিশাচরী এসে ওদের আক্রমণ করতে পারে। তারা হয়ত তোমার মত চুম্বন করবে না।

শম্ভু এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বালকটিকে টেনে নিয়ে রওয়ানা হয় পাহাড়ের দিকে।

এই বালকই পরবর্তীকালে দেবক মান্যমান নামে পরিচিত হয়।

এই বালক দাসজাতির সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল আর আর্যদের ভয়ঙ্কর শত্রু হয়েছিল। দেবকের নামে আর্যদের ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত ; এমন বলবান এবং নিপুণ যোদ্ধা ছিল সে।

কিলাত জাতির দেহের রং ছিল হলুদ, মাথার চুল কালো আর দাড়ী গোঁফ হীন। কিন্তু দেবকের ছিল একেবারে বিপরীত। রূপোর মত ঝাঁকড়া চুল, ফিকে হলুদ গোঁফ-দাড়ী আর নীল রঙের চোখ।

যে রূপ দেখলে দাসজাতি ক্ষুধার্ত বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; কিন্তু দেবক সমগ্র দাসজাতির মন থেকে অন্ততঃ তার জন্য সেই চিন্তা দূর করতে সমর্থ হয়েছিল।

দেবকের চেয়ে বড় আত্মীয় দাসজাতির আর কেউ ছিল না।

দাসজাতির ইতিহাসে একমাত্র দেবকই ব্যতিক্রম। সে সম্পূর্ণ শত্রুর রং রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সমগ্র দাসজাতির নেতৃত্ব করতে পেরেছে। দাসজাতি অন্ততঃ একজন পীতকেশীকে আপনজন বলে বিশ্বাস করতে পেরেছিল, সে দেবক।

শিশুকালে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়তে কয়েক বৎসরেই দেবক কিলাতদের ভাষা আয়ত্ব করে নেয় এবং আর্যভাষা ভুলে যায়। সেই শিশুকাল থেকেই দেবক নিজেকে দাস বলে মনে করত।

প্রথম কয়েক বৎসর যাবৎ শম্ভু দেবককে নিজের কাছ ছাড়া করত না। এর প্রথম কারণ ছিল আর্যশিশু বলে কেউ সুযোগ পেলে ওকে হয়ত মেরে ফেলবে। দেবকের উপর শম্ভুর একটা আন্তরিক মমতা পড়ে গিয়ে ছিল; তারপর ওর ব্যবহারে সত্যিই ওকে নিজের পুত্রের স্থান দিয়েছিল শম্ভু।

এই পুত্রস্নেহের জন্যেই ক্ষণিক বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারত না শম্ভু। এমনি করে দেবক ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

শম্বর প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিল দেবককে।

বাল্যাবস্থা শেষ হতে শম্বর বুঝতে পারে এ সন্তান তাদের আপন সন্তানের মতই সব আচার ব্যবহার আয়ত্ব করেছে। তখন শম্বরও দেবককে নাতি বলে স্নেহ করতে আরম্ভ করল।

মাঝে মাঝে দেবকেরও নিজের রং রূপের উপর ভীষণ ঘৃণা হত।

কিন্তু কিলাতরা ওকে আপনজন বলে খুব আদর যত্ন করত। এমনি ধীরে ধীরে সে-ভাবটা ওর মন থেকে কেটে গেল।

এই দেবকই একমাত্র পীতকেশী যে হিমালয়ের বৃহৎ পর্বতমালার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জায়গা ঘুরেছে।

অন্য যে কোনো আর্য বড়জোর এক-দুই যোজন রাস্তা পর্বতের মধ্যে যেতে না যেতেই প্রাণ হারাত নিশ্চয়।

ধীরে ধীরে যখন সকল কিলাত জানতে পারল ঐ পীতকেশী তাদেরই একান্ত আপনার জন, তখন দেবকের জন্য হিমালয়ের গলি-ঘুঁচি বাড়ী ঘরের মত হয়ে যায়।

বহুদিন ঘোরাঘুরি করবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবক বলল,—হিমালয়ের বৃহৎ পর্বতগুলির মধ্যে যে জায়গাটা বারোমাস সাদা বরফে ঢাকা ঐ জায়গা হ'ল হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু। ওখান থেকে যতই আগে যাবে ততই উঁচু হতে থাকবে, তাছাড়া পথের চিহ্ন রাখা কঠিন আর ভীষণ পরিশ্রম হয়।

কিন্তু কিলাতরা বিপাশ নদীর উৎস পর্যন্ত অনায়াসে পথ চিনে যেতে পারে। আরও আশপাশে প্রয়োজন মত ঘাস বা পাতা দিয়ে ওরা চিহ্ন তৈরী করে যায় যাতে ফিরবার সময় পথের ভুল না হয়। ওখানকার শীতের তুলনা হয় না। দামী ভেড়া বা ভল্লুকের চামড়া দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে চাপা দিয়ে রেখেও সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পায় না।

নেহাৎ দরকার না হলে অত উঁচুতে কেউ যায় না।

দেবক যখন হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চলের এই সব কথা বলছিল তখন একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করল,—ভালুকের চামড়াও পরা যায়?

—হা। তাছাড়া ওখানকার ভালুকগুলি কয়েকটি রঙের হয়ে থাকে। ওদিকে ভালুক সাদা বা ধূসব রঙের হয়।

—ধূসর ? আশ্চর্য হয় শ্রোতা। ভাবে ভালুক ত কালো হবে।

—হ্যাঁ একটু লালচে মেশানো ধূসর। আরও আশ্চর্য হবে শুনে তারা সারা শীতকাল ঘুমিয়ে থাকে।

—বলো কি ?

—ঠিক বলছি। যখন ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করে, তখন উপরের পাহাড়ে বরফ জমতে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে পশু প্রভৃতি নিচের দিকে নামতে থাকে। যেমন কিলাত জাতি নিচের দিকে শিকার খুঁজতে বেরোয়, তার কারণ ঐসময়ে জন্তু জানোয়ার সব গরম জায়গার সন্ধানে নিচের দিকে নামতে থাকে। সেই সময়ে ঐ ধূসর ভালুকগুলো নিচেয় না এসে কোনো অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে থাকে। এতদিন ওরা মূর্চ্ছা যাবার মত ঝিমিয়ে থাকে। একটুও নড়ে চড়ে না।

—বাপরে, ছয়মাস না খেয়ে কি করে বেঁচে থাকে ?

—ঘুমই ওদের বাঁচিয়ে রাখে। যতদিন ঘুমিয়ে থাকে ততদিন খিদে পায় না বা খাবার দরকার হয় না। আমি তেমনি অবস্থায় ভালুক শিকার করেছি। আমি যখন ভালুকটিকে মেরেছিলাম তখন সে ঘুমিয়েছিল এবং ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে। যেমন কোন মুর্চ্ছিত মানুষকে গদার প্রহার করলে চুপচাপ মারা যায় তেমনি ভালুকও ঘুমের ঘোরে মারা যায়।

তখন ছিল বসন্তকাল। তখন বুঝলাম আবহাওয়া যেমন যেমন গরম হতে থাকে ওদের শরীরেও তেমনি তেমনি গরম গিয়ে প্রাণের সঞ্চার করে। তারপর জ্ঞান ফিরে আসতেই আবার খাদ্যের সন্ধানে বেরোয়।

ওখানকার বনস্পতির নিয়মও আমাদের এই নিচেকার চেয়ে

ভিন্ন ধরণের। ওখানে বসন্তকালে গাছের পাতা ঝরে না। শরৎ-কালে সব গাছ ন্যাড়া হয়ে যায়। তবুও একরকম গাছ আছে যার পাতা বারোমাস সবুজ থাকে। ঐ একজাতের গাছ ছাড়া শরতকালে সেখানে সবুজের নাম গন্ধ থাকে না।

—সত্যিই আশ্চর্য লাগছে।

—আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাছাড়া আমাদের জাতির অনেকে হয়ত দেখে থাকবে। এখন ত সে গাছের নাম রেখেছে দেবদারু অর্থাৎ দেবতাদের গাছ।

—হ্যাঁ, দেবদারু নাম ত শুনেছি কিন্তু দেবতাদের গাছ বলে ত জানি না।

—তাহলে ঐ সাদা বিরাট পর্বতমালাকে দেবতার স্থান বা দেবলোক বলতে পারো। তারপর দেবদারু গাছেরও একটা সীমা আছে। সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে আর দেবদারু পাওয়া যাবে না। সেখানে আছে সাদা ছালওয়ালা একরকম গাছ। তাকে আমরা ভোজপত্র বলি। ওরা ভীষণ বরফের ঝড়ের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষমতা রাখে। সেখানে আবার নানা অদ্ভুত ধরনের পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-বনস্পতি দেখতে পাওয়া যায়। সে সব যারা না দেখেছে তারা বিশ্বাস করবে না। শুধু তাই নয়, পাখীর মত অথচ ডানা নেই এমন জন্তু গিলহরী যখন গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন আশ্চর্যের সীমা থাকে না। এসব আমার নিজের চোখে দেখা।

আর্যজাতির বন্দী শিবিরে বন্দী অবস্থায় দেবক তার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিল।

কিছুদিন আগে আর্যদের সঙ্গে ভয়ানক এক সঙ্ঘর্ষে দেবক আহত হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় বন্দী হয়ে এখানে আনীত হয়েছে। ওর হাত-পায়ের প্রায় সব সন্ধিগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল। নিজের খুশীমত

নাড়াচাড়া করবারও ক্ষমতা ছিল না। এমন কি কতকগুলি আঘাত এমন সব জায়গায় লেগেছিল যা আর ভালো হয়নি।

অনেকদিন কষ্ট সহ্য করবার পর বন্দী শিবিরেই তার মৃত্যু হয়।

কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শম্ভুর নাম শুনলেই দেবক শিশুর মত কেঁদে ফেলত আর শম্ভুমা, শম্ভুমা বলত।

যদি কখনো কেউ প্রশ্ন করতো,—আচ্ছা দেবক! যদি তোমার পা ভালো হয়ে যায় এবং এখান থেকে ছাড়া পাও, তাহলে তুমি কি করবে?

—এক একজন করে সমস্ত আর্যজাতিকে হত্যা করব। এই আমার একমাত্র ইচ্ছা। আমার শম্ভু মাকে যে শত্রুরা মেরেছে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই।

জলের দর্পণে ওর চেহারা দেখিয়ে কেউ যদি বলত,—দেবক! চেয়ে দেখ তোমার চোখ, মুখ, নাক, দাড়ী, গোঁফ, দেহের বর্ণ সবই আর্যজাতির। এ দেখেও তোমার বিশ্বাস হয় না যে তুমি আর্যজাতি, আর্যমাতার সন্তান, তুমি আমাদের ভাই। দাস-সন্তান নও?

—না, না, না। দেবক চীৎকার করে উঠত। আমি আর্যসন্তান হতে চাই না। যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে আমি শম্ভু মাকে পেয়েছি। তাকে হত্যার প্রতিশোধ আমি নেব, নেবই। আমার পরবর্তী জীবনের প্রধান কর্তব্য হবে আর্যজাতির ধ্বংস করা।

—প্রতিশোধ নেবার আশা এখন ছেড়ে দাও। বিনা হাত-পা'য়ে মাটিতে পড়ে পড়ে তুমি কি প্রতিশোধ নেবে? কিন্তু তোমার বর্ণ এবং দেহের আকৃতি দেখে কি তোমার বিশ্বাস হয় না যে তুমি আর্য মায়ের সন্তান?

—তোমার উত্তর দেবার দরকার মনে করি না আমি। আমি শুধু এইটুকু জানি যে আমার এ হৃদয় শম্ভু মাতার স্নেহের দান, আমি শম্ভু মায়ের। আর কিছু বলতে চাই না।

কয়েকদিন পর দেবক মান্যমান-এর মৃত্যু হল। শেষ অবধি তার পায়ের ঘা ভাল হ'ল না। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবত আর্যজাতির ত্রাস দেবকের দেহান্ত হতে পীতকেশীরা নিশ্চিন্ত হতে পারল।

তবে মৃত্যুর কয়েক দিন আগে দেবক বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে সে আর্যমায়ের সন্তান এবং তাকে শম্ভু মা নিজের সন্তান বলে লালন পালন করেছিল।

## ॥ দশ ॥

**"অত্রা দাসস্য নমুচেঃশিরো যদবর্ত্তয়ো, মনবে গাতুমিচ্ছন"**

[ ঋক, ৫।৩০।৭ ]

বিপাশের উপরের জঙ্গলে সমিধা বা যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালাবার কাঠ জোগাড় করবার জন্য প্রতিদিন সকালে আর্য বালক বালিকাদের ভীড় লেগে যেত। কেউ সমী-র শুকনো কাঠ সংগ্রহ করত, কেউ সবুজ দুর্বা, কেউ সংগ্রহ করত নানা প্রকার ফুল। কেউ বা আসনের জন্য কুশ সংগ্রহ করত।

এই সব বালক বালিকা বেশির ভাগ দশ থেকে পনের বৎসর বয়সের হত।

সেদিন সোমশ্রবা বলছিল,—ভগবান ঋষিকে দেখলে মনেই হয় না যে তাঁর বয়স সত্তর বৎসর পার হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, তাঁর সাদা দাড়ী আর চুল বাদ দিলে এখনো একেবারে কাঁচা তরুণ বলে মনে হয়। কেমন উৎসাহের সঙ্গে আজ তিনি আমাদের পূর্ব ঋষিদের সম্বন্ধে আর্যভূমিকে ডেকে ডেকে বলছেন যে মনুর বংশধর "নমুচি অসুর"দের ঘাড় মটকে দিয়েছে। এজন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক হলেন ইন্দ্র। তাঁর ইচ্ছায় ও আর্যদের দ্বারায় সম্ভব হয়েছে।

—হ্যাঁ ভাই ঋষি যখন এই কথা বলছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন ইন্দ্র স্বয়ং ঋষির মুখ দিয়ে তার কথা বলছেন। তখন ঋষির সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছিল।

—তিনি বলেছেন আর্যজাতির পাঁচ জন একসঙ্গে মিলিত হয়ে নমুচি এবং তার সমস্ত অসুর জাতিকে নাশ করেছে। ইন্দ্র বলেছেন,

—তোমরা এক হয়ে লড়াই করো, তোমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই সুখের ইটের তৈরী নগরী নমুচী রক্ষা করতে পারবে না। আর হলও তাই। দধিচী, অঙ্গিরা, প্রিয়মেঘ, কণ্ব, অত্রি প্রভৃতি আমাদের পূর্ব বংশধরেরা মিলে পণি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করে সপ্তসিন্ধুকে জয় করে আর্যভূমি করে গেছেন। এখন তুর্বশ, যদু, সৃঞ্জয়, পুরু নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির জন্য একে অপর থেকে দূরে সরে রয়েছেন। আমাদের মহান দেব ইন্দ্র বলেছেন,—হয়ত তোমাদের নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে তোমরা অসুর ধ্বংশ করো। নয়ত ঐ বিরাট পাহাড় ইন্দ্রের বজ্র হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে। এক একজন করে তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সোমশ্রবা ঋষির বচন আরো স্পষ্ট করে বলে,—নমুচি এবং তার অসুর অন্য জাতের। তারা মরতে জানে, মারতে জানে কিন্তু হতাশ হতে জানে না। যুদ্ধের ভূমিতে তাদের দল আর্যদের হাতে কচুকাটা হতে হতেও আর্য সেনার ভিতরে এগিয়ে গেছে। ইন্দ্র যদি আর্যদের উপর রুষ্ট হ'ন তাহলে ওদের শক্তি আরো বেড়ে যাবে।

তাছাড়া ঋষি এমন অদ্ভুত ভাবে বলতেন যে তাঁর কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। তিনি বলতেন, যতক্ষণ শম্বরের অসুর আমাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে ততক্ষণ আমরা মিলিত ভাবে যদি তাদের ধ্বংসের চেষ্টা না করি তাহলে আমাদের মঙ্গল নেই।

একজন তরুণ তাব কথার মাঝে বলে ফেলল,—ঋষি এও বলেছেন, কিলাত অসুর আমাদের কাছে পঙ্গপালের মত ভয়ানক। ওদের ক্ষীণ চেহারা, দেখতে বেঁটে, হলুদ রং, জংলী স্বভাব। ওদের পাঁচটা অসুর একজন আর্যের কাছে কিছু নয়। তবে আমরা যদি ওদের ধ্বংস করতে চাই তাহলে মিলিত চেষ্টায়ই ধ্বংস করতে পারি।

তারা সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন আমাদের শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য। ঋষি বললেন,—নমুচির অসুর বড় বড় গ্রাম সুন্দর সুন্দর নগরী স্থাপন করে সুখে দিন যাপন করছে। তখন আমরা তাদের অনায়াসে অধিকার করে তাদের সব কিছু নিয়ে নিতাম। কিন্তু শম্বর অসুররা গ্রাম পত্তন করত না বা ক্ষেতের উপর নির্ভর করত না। হেরে গেলে হারাবার ভয় ছিল না তাদের। সামান্য কখানা পাথরের থালা আর খানকয়েক তামার অস্ত্র নিয়ে যেখানে খুশী পালিয়ে যেত।

—তাত যাবেই, বলল অন্য তরুণ। ওদের সবচেয়ে বড় সুযোগ ছিল বিশাল হিমালয় পর্বত। লুকোবার জায়গার অভাব নেই।

—আমরা ত শুধু শুনে এসব কথা বলছি। চাক্ষুষ ত দেখিনি। সেই হিমালয়ের গা বেয়ে বিপাশ বয়ে এতদূর এসেছে। সেখানে বিপাশের বরফ গলা জল এত ঠাণ্ডা যে মানুষ গেলে জমে হিম হয়ে যায়। সেখানে দেবদারুর মত গাছের বিরাট জঙ্গল আছে। সেখানে বসন্তকালে গাছের পাতা ঝরে না। তাছাড়া দেবদারুর পাতা কখনোই ঝরে পড়ে না বা সবুজহীন হয় না।

—সেখানে নাকি এমন ভালুক আছে যারা ছয় মাস ঘুমায়।

—আর সেও নাকি লালচে-ধূসর রঙের।

—যাই হোক এটা ঠিক যে অতবড় হিমালয়ের মধ্যে ওদের গতি অব্যাহত ছিল বলেই সেই সব দুর্গম অঞ্চলে ওরা পালিয়ে গিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারত। আমরা ত সেখানে যাবার নাম শুনলেই ভয়ে বরফের মত জমে যাই।

—ঋষি বলেছেন, একবার যদি আমরা পরুষ্ণী আর বিপাশের তরাইতে কিরাত অসুরদের বাধা দিতে অসমর্থ হই তাহলে প্রলয়ের স্রোত সারা সপ্তসিন্ধুর উপর এমন ভাবে নেমে আসবে যে আর্য বলে কোনো কিছু যে ছিল তার চিহ্নটুকু আর থাকবে না।

—সেই জন্যেই ত যদু আর তুর্বশ জন-এর মন গলে গিয়েছিল। তাদের তরুণরা ঋষির সামনে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল,—ভগবান! আমাদের বৃদ্ধেরা যাই ভাবুন না কেন আমরা অর্থাৎ যদু আর তুর্বশ তরুণরা তাদের কথামত আমাদের আর্য পঞ্চ-জনকে হত্যা করব না। আপনি যা আজ্ঞা করবেন তাকেই আমরা কর্তব্য বলে মনে করব।

—সেই কথা শুনে ঋষি বলেছেন,—আমার আজ্ঞা নয়, স্বয়ং ইন্দ্রের আজ্ঞা। তিনি বলেছেন বধ্রযশ্ব পুত্র দিবোদাসকে সারথি (সেনাপতি) করে কিলাতদের সঙ্গে ততক্ষণ লড়তে থাকো যতক্ষণ একজনও কিলাত জীবিত থাকবে সপ্তসিন্ধুর উত্তর সীমান্তে।

—হয়েছেও তাই। বলল আর এক তরুণ। যদু, তুর্বশ, পুরু প্রভৃতি অন্যান্য আর্য তরুণ রাজকুমার ঋষির সামনে অগ্নির শপথ নিয়ে কিলাতের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছে।

আজ আমাদের গোত্রে গোত্রে যে অদ্ভুত মৈত্রীভাব দেখছি সে ঐ মহাঋষির শ্রেষ্ঠ দান। আজ মনে হচ্ছে সকল আর্য একই আর্য-মায়ের সন্তান। তেমনি আপন সহোদর ভাইয়ের মতই আজ আমরা একের সঙ্গে অপরে মিশছি। পান, ভোজন, হর্ষোল্লাসে যোগ দিচ্ছি। তাই দেখেই ত ঋষি আনন্দে স্বীকার করেছেন,—আমাদের শেষ অসুর শত্রু শম্বর ও তার অসুরদের এবার ধ্বংস করতে সমর্থ হব। আর তাদের রক্ষা নেই। এরপর আর্যজাতি ইন্দ্রের ভক্ত হয়ে অনন্তকাল সপ্তসিন্ধুর ভূমিতে ভোগ দখল করবে।

আর্য জন-এর মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ সৃষ্টি করতে সবচেয়ে বেশি চেষ্টিত ছিল যদু আর তুর্বশ।

ভরদ্বাজ ঋষির প্রথম নজর পড়ে তাদেরই উপর। তিনি তখন বিনা হাতিয়ারে, সেনাদল সঙ্গে না নিয়ে দক্ষিণ দেশে রওয়ানা হলেন। তাঁর চলার পথে গ্রামে গ্রামে, হাটে-মাঠে, পথে-প্রান্তরে তিনি গলা ফাটিয়ে বলতে বলতে চললেন,

"এ আমার আজ্ঞা নয়, স্বয়ং ইন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা। আমি প্রচারক মাত্র। আমি এখানে অস্ত্র বা সৈন্যবলে জয়লাভ করতে আসিনি। আমি এসেছি বন্ধুত্ব-প্রীতির বন্ধনে সকল আর্যজনকে বাঁধতে। আমি জানি তারা শুধু ভুল করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। আমি তাদের বোঝাতে এসেছি যে কেমন করে আমাদের পূর্ব বংশধরেরা বিজয়ী হয়েছিলেন। ইন্দ্র মনু এবং দধীচিকে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন এবং আমাদের জনকে বলেছিলেন,—তোমরা এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাও, আমি নিজে তোমাদের সঙ্গে আছি।

আজ আমার বন্ধুদের সামনে এসে তাদের ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে যদি তাদের হাতে আমার প্রাণ যায় তাহলে আমি সে মৃত্যুকে স্বর্গ সুখ বলে ভাবব। আমি ইন্দ্রের কাজ করতে এসে জীবন দিতে পেরেছি এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আমি জানি ইন্দ্র তাঁর শত্রুদের অর্থাৎ অসুরদের ধ্বংস করবার জন্য অন্য কাউকে পাঠাবেন। তাঁর সঙ্কল্প অপূর্ণ থাকতে পারে না।

এমনি দৃঢ় ভাবনা নিয়ে ঋষি দক্ষিণ দিকে চললেন। তাঁর সঙ্গে সহস্র সহস্র আর্য তরুণ চলল। এদের মধ্যেও যদু এবং তুর্বশদের সংখ্যা ছিল অধিক।

সকল জনজ্যেষ্ঠ একত্রিত হল।

তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল।

তাদের তরুণরা বলে দিয়েছে,—আমরা ঋষির সঙ্গে চললাম। তাঁরই সঙ্গে জীবিত বা মৃতকাল পর্যন্ত থাকব। যদু যদি ঋষির কথা মেনে না নেয় তাহলে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেরাই দায়ী থাকবে। যদু বা তুর্বশ জন-এর কোনো তরুণ আপনাদের সঙ্গে থাকবে না। যদি কেউ ঋষির প্রাণ হরণ করে তাহলে আমরাও

সকলে নিজেদের প্রাণ ত্যাগ করব। আর ঋষি যদি শূন্য হাতে ফিরে যান তাহলে আমরাও তাঁর সঙ্গে ফিরে যাব।

একতার মন্ত্রে যদু তুর্বশকে বশে আনতে পারবার পর সমগ্র আর্য ভূমিতে ঋষি ভরদ্বাজের জয়-জয়কার পড়ে যায়।

ঋষি বললেন,—এখনো আমাদের শত্রু নিশ্চিহ্ন হয়নি। তাদের নিপাত না করা পর্যন্ত এই জয়-জয়কারের কোনো প্রয়োজন নেই।

ভরদ্বাজ প্রতিষ্ঠিত এই একতা দেখে সকলের মনে বিশ্বাস জন্মাল যে এবার অসুর জাতি নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন হবে। আর সোম-এর ভূমি ঐ বৃহত পর্বতমালা আমাদের হয়ে যাবে। আর্যদের উপর অসুরদের সঙ্কট চিরকালের জন্য লোপ পেয়ে যাবে।

নম্রতায় দিবোদাস পিতা বধ্র্যশ্বের চেয়েও এগিয়ে গিয়েছিল।

সমগ্র আর্যজনকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে,—আমি আপনাদের রাজা বা প্রভু নই। আমি আপনাদের রঞ্জনকারী সেবক মাত্র।

পুরু জন চিরকাল নিজেদের শ্রেষ্ঠ জন বলে গর্ব করত।

কিন্তু ত্রসদস্যু তার মামাতো ভাই দিবোদাসের ব্যবহারে অভিভূত ছিল।

ত্রসদস্যুর জন্য পুরু আর তৃৎসু মিলে এক হয়ে যায়।

মাত্র কয়েক বৎসর আগে সারা সপ্তসিন্ধুতে “আমি বড়”, “আমি বড়” ভাব নিয়ে যে বৈমনস্য সৃষ্টি হয়েছিল, ঋষি ভরদ্বাজের চেষ্টায় আজ সমগ্র সপ্তসিন্ধুর মিলিত জনতার কণ্ঠে একই শব্দ,—আমরা ইন্দ্রের সঙ্কল্পের জন্য, ঋষি ভরদ্বাজের সঙ্কল্পের জন্য, তাঁর সেবক রাজা দিবোদাসের সঙ্কল্পের জন্য দস্যুহত্যার জন্য একজাতি একপ্রাণ হয়ে প্রস্তুত। ঋষির আজ্ঞা হলে, রাজা দিবোদাসের আজ্ঞা হলে আমরা একসঙ্গে প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত।

ঋষি ভরদ্বাজের মনে বিজয়ীর আনন্দ, সাফল্যের তৃপ্তি।

রাজা দিবোদাসের মনে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, জয়ের কঠোর নিশ্চয়তা।

ভরদ্বাজ পুত্র গর্গ সদা সর্বদা দিবোদাসের সঙ্গে বড় ভাইয়ের মত থাকত। তাছাড়া দিবোদাসের পরম মিত্র কুৎস আর্জুনেয় প্রভৃতি সকলে দস্যু বিজয়ের প্রস্তুতি করতে লাগল।

সে বছরও পর্বত সানুদেশে কিলাতদের আক্রমণ হ'ল। কিন্তু আর্যরা তেমন জোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হল না।

সামান্য সজ্ঘর্ষ হ'ল এবং কিছু গরু ভেড়া হরণ হল।

পরের বারের জন্য আর্যজাতির প্রচণ্ড প্রস্তুতি অব্যাহত রইল।

## ॥ এগার ॥

**মহো দ্রুহো......বজ্রস্যযৎপতনে শুষ্ণঃ।**
**উরুষ এক সরথং সারথয়ে কুৎসাম উগ্রো পুরোহিতঃ ॥**

[ ঋক, ১০।১৫০ ]

ঋষি ভরদ্বাজ ভুজ্যুর মত অদম্য সেনাপতি পেয়েছিলেন। পুরু কুৎসও তার চেয়ে কম মহাশূর ছিল না।

তেমনি শম্বর সেনাপতি শুষ্ণ, অশুষ, কুয়ব প্রভৃতিও ওদের চেয়ে কম ছিল না।

অসুরদের শারদীয় বাসস্থান যদিও কেবলমাত্র শীতের সময়ের জন্য হলেও তারা জানত যদি কোন প্রকারে আর্যরা আমাদের ভূমি অধিকার করে নিতে পারে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যদি বৎসরের অন্যান্য মাসগুলি আমাদের বৃহৎ পর্বতের মধ্যেই বাস করতে হয় তাহলে পর্বতের নিচেকার ঐ ভূমিতে আমাদের শারৎকালীন বাসস্থান রাখতেই হবে। তার জন্য যা কিছু বলিদান দিতে হোক না কেন ঐ ভূমি হাতছাড়া করা কোনো প্রকারেই চলতে পারে না।

অসুর সেনাপতি শুষ্ণ অসুররাজের এই মতকে সমর্থন করে এবার শীতের সময় বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে নিচেয় নেমে আসে। তার সঙ্গে কয়েক শত সহস্র অসুরও চলে আসে।

পূর্বের নির্ণয় অনুযায়ী নিচেয় ভিন্ন ভিন্ন ঘাঁটি তৈরী করে ওরা।

অশুষ, কুয়ব, পিপ্রু, বংগ্রীহ, করঞ্জ, পর্ণয়, বর্চী প্রভৃতি মহা মহা সেনাপতি এক এক ঘাঁটির কর্তৃত্ব নেয়।

প্রথমেই বলা হয়েছে, আর্যদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল ঘোড়া।

কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল অসুরদের নিশাচরী বৃত্তি।

মাত্র একটি রাত্রের মধ্যে কিলাত ভূমির পঞ্চাশ ষাট যোজনের মধ্যে যে কোনও আর্য গ্রামের অধিবাসীকে আক্রমণ করে মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দিয়ে আসতে পারত।

পঞ্চাশ-ষাট যোজনের মধ্যে যতগুলি আর্যগ্রাম পড়ে সেগুলি সবই খড়কুটোর তৈরী বা নেহাত সাধারণ জনতা বাস করে। একটু সঙ্কেত পেলেই এই সব গ্রামের পশু বা অধিবাসীদের সরিয়ে নেওয়া হয়।

কুৎস জানত শুষ্ণ সেনাপতি—অসুর শম্বর-এর ডানহাত। আর্যরা অনেক চেষ্টা করেও আসল কথা জানতে পারে না যে শুষ্ণ কোন নগরীর স্বামী। আর্যগুপ্তচর বহু চেষ্টা করেও তাদের গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

অসুর-পুরী পর্যন্ত কোনো পীতকেশীর আজ পর্যন্ত বিনাযুদ্ধে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। একমাত্র পণিজাতিই ছিল যারা আর্য বা কিলাত নগরীর মধ্যে যাতায়াত করতে পারত। তার প্রধান কারণ ছিল পণিরাই সকল জাতির জন্য তামার অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করত। খাওয়া এবং অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর ব্যাপার একমাত্র পণিরাই করত। ব্যবসার জন্য বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে বাধ্য হত তারা।

সব দিক বিচার করে কুৎস পণিদের দিয়ে গুপ্তচরের কাজ করাতে লাগল।

এমনি একদিন একজন চর পণি এসে কুৎসকে একটি অসুর-পুরীর বর্ণনা দিল। কুৎস আন্দাজ করে ঐটা নিশ্চয় শুষ্ণর অধীন। সেই পুরীতে ছিল দশ হাজার গরু, ভেড়া প্রভৃতি পশু। তাছাড়া সেখানকার সকলেই যোদ্ধা। সকলেই তারা যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

পণি নিশ্চয় করে বলতে পারে না, সে যে পুরুষটিকে সেই পুরীতে

দেখে এসেছে সেই কিলাত সেনাপতি মহাযোদ্ধা শুষ্ণ। কিন্তু অসুর জাতির মধ্যে শম্বর ছাড়া অতখানি প্রভাবান্বিত ব্যক্তি যদি আর কেউ থাকে তার নাম শুষ্ণ।

পণি অসুর ভাষা কিছু জানে। সে নিজের কানে শুষ্ণর নাম শুনেছে কিন্তু যেহেতু সে নিজের চোখে এর আগে আর কখনো শুষ্ণকে দেখেনি বলে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারছে না ঐ লোকটাই শুষ্ণ।

তবুও অন্যান্য সংবাদের উপর ভিত্তি করে কুৎস নিশ্চয় করে ঐ পুরীই শুষ্ণ অধীনস্থ পুরী আর সেই ব্যক্তিই কিলাত সেনাপতি শুষ্ণ।

অতএব সর্ব প্রথম শুষ্ণপুরী আক্রমণ করবার কথা চিন্তা করতে থাকে আর্যসুরী বা আর্য রাজকুমাররা।

দিবোদাসও সেখানে উপস্থিত ছিল। লোকে বলে,—অসুর যতখানি তাদের মায়া-শক্তিতে যুদ্ধ করতে পারে ততখানি দৈহিক শক্তিতে লড়তে পারে না। তাই আমরা তাদের কবে, কখন, কিভাবে আক্রমণ করব তা যেন ওরা ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। কোনক্রমেই যেন ওরা টের না পায় আমরা কত সেনা নিয়ে আক্রমণ করব।

—তা ত বটেই। উত্তর দেয় দিবোদাস,—তাহলে ওরা ঠিক সময় মত পালিয়ে যাবে।

—আর একবার যদি ওরা পালাতে পারে তাহলে আমাদের জয়ের আশা আরো কয়েক বৎসর পিছিয়ে যাবে। বলল কুৎস,—একবার যদি শুষ্ণ এবং তার বাহিনীকে আমরা নষ্ট করতে পারি তাহলে নিশ্চয় জানবে যে শম্বর-এর ডানহাত কাটা হয়ে যাবে।

—সেই জন্যেই আমাদের এমন সাবধানে ওদের আক্রমণ করতে হবে, যেন একেবারে শিয়রে গিয়ে পৌঁছলে তবে জানতে পারবে। বলল দিবোদাস।

এবার শীতের আগেই আর্যসেনা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেছে। সপ্তসিন্ধুর প্রতি পরিবার মিলে এক পরিবার হয়ে গেছে। অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সকলের যুদ্ধ। অসুরদের বিপদ যখন সমগ্র আর্যজাতির বিপদ তখন সকলেই আর্যরাজার ছত্রছায়ায় একত্র হয়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে, অসুরদের নিপাত না করা পর্যন্ত তারা শান্তির নিশ্বাস ফেলবে না।

ঋষি ভরদ্বাজের কঠিন পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

আর্যজাতির পঞ্চজন আজ দিবোদাসের নেতৃত্ব মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে। সকলের ঘরে ঘরে সাজ সাজ রব, তবে হঠাৎ বাইরের কারো সন্দেহ করবার উপায় নেই।

প্রস্তুতি শেষ হলে সকল আর্যসুরি, মুখ্য এবং ঋষির মত নিয়ে রাতের বেলা যাত্রা করা ঠিক হল।

সামনে ঘোর অরণ্যানীর ঘন ঘন গাছপালা এমন গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে যে অন্ধকার রাত্রে রাস্তা খুঁজে সরলভাবে একপাও এগুনো অসম্ভব।

তাছাড়া অরণ্যের হিংস্র পশুর ভয় এ অঞ্চলে বেশি।

কোথাও হাতীর দল অপেক্ষা করছে, কোথাও হয়ত হিংস্র সিংহ বা বাঘ ওত পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না তারা।

হয়ত হাজার হাজার অশ্বারোহীর কোলাহলে তারা ভয়ে পালিয়ে যেত, কিন্তু এতটুকু শব্দ যাতে না হয় তেমনি চলতে হবে ওদের। নইলে অসুররা যদি জানতে পারে তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

যাত্রার প্রারম্ভে ইন্দ্র এবং অগ্নিকে প্রার্থনা জানায় সকলে। যেন সকল আর্যবীর অক্ষত শরীরে শত্রুকে পরাস্ত করতে পারে।

পথ-প্রদর্শক খুব সন্তর্পণে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলে। অরণ্যবাসী নিষাদ পথ দেখানোর কাজ করছে। নিষাদরা বৃহৎ পর্বতের দিকে

জঙ্গলে খুব বেশি বিচরণ করে না বলে ওদিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা খুব বেশী নয়। ওরা দক্ষিণের জঙ্গলের সঙ্গে বেশির ভাগ পরিচিত। তবুও এই দুই দিকের অরণ্য বা অরণ্য-পশুর মধ্যে অনেকখানি সমানতা রয়েছে। নিষাদ বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বলল,—এ সব জঙ্গলে যেখান সেখান থেকে প্রবেশ করা ঠিক নয়। আমাদের যাওয়ার পথ যদি ছোট নদীর শুকনো ধারা পথ বরাবর হয় তাহলে ভাল হয়।

—এদিক দিয়ে বিপাশের ধারার পাশ দিয়ে যদি যাই? বলল একজন আর্যসুন্দরী।

—না। তাহলে বিপদ আরো বাড়বে। কারণ অরণ্যের প্রায় সকল জন্তু জানোয়ার রাত্রে বিপাশের তীরে জল খাবার জন্য আসে। মানুষের গন্ধ পেয়ে একবার যদি ওরা ভয় পেয়ে ছুটতে থাকে তাহলে মুহূর্ত মধ্যে সকল অরণ্য সচকিত হয়ে উঠবে। বলল নিষাদ বৃদ্ধ।

অতঃপর একটা ছোট নদীর প্রায় শুষ্ক ধারার পাশ দিয়ে ওরা চলতে থাকে। পণি গুপ্তচরের নির্দেশানুযায়ী এই শুকনো ধারা এঁকে বেঁকে শুষ্ণপুরীতে চলে গেছে।

এবারের যাত্রায় সাদা ঘোড়ার প্রয়োজন হয়নি। তাহলে রাত্রের যাত্রার ভেদ প্রকাশ হয়ে যাবে। লাল বা শ্যামবর্ণের ঘোড়ার অভাব নেই আর্যভূমিতে।

দিবোদাস কুৎসকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে আঘ্রাণ নেয়। তারপর নালার কাছ থেকে কুৎস সেনাপতির বাহিনী ডানদিকে উত্তরদিকের পথ ধরে এগিয়ে যায়।

এ রাস্তায় হিংস্র জন্তু দেখা যায় না। কারণ এদিকে জল নেই। তবুও শিয়াল, খরগোশ প্রভৃতি ছোট জন্তুরা মানুষের শব্দ পেয়ে যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালালো। এই শুকনো এলাকায় বাঁশঝাড় বা গাছের সবুজ পাতার সমারোহ তেমন নেই

বলে হাতীর ভয় নেই এখানে, আর ছোট তৃণ-লতার অভাব বলে মৃগ বা গবয়-এর দলও আসে না। শুকনো নদীর ধারার আশপাশের অনেকখানি জায়গা একেবারে খোলা এবং কঙ্করময়।

অন্ধকারের বুক চিরে আর্যবাহিনী তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। ওদের হিসাব মত রাত্রের মধ্যেই ওরা শুষ্কপুরীতে গিয়ে পৌঁছবে। সকলে মনে মনে প্রার্থনা করে আজ যেন সূর্যদেব একটু দেরী করে আকাশে উদয় হন।

হাজার হাজার ঘোড়ার খুরের টপাটপ শব্দ রাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এগিয়ে চলেছে। সকলের কানে ঐ একমাত্র শব্দ। সকলের লক্ষ্য সামনের দিকে।

এতক্ষণের যাত্রার নির্বিঘ্নতা অনেকের মনে আশার সঞ্চার হয়।

হঠাৎ সামনের ঘোড়ার সারি কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে যায়। সকলে চমকে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে।

খানিকটা দূরে একটা হাতীর দল বিরাট একটা বটগাছের ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে পাতা খাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দে হাতীর দল সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। একটি গজরাজ খানিক এগিয়ে এসে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে।

সময় খুব কম।

এক মুহূর্তের মধ্যে যা কিছু করবার করতে হবে।

সেনাদল এগিয়ে যায় সামনের দিকে হাতীর দলকে ভ্রুক্ষেপ না করে। হাতীর দল অবশ্য জানত তাদের চেয়ে আকারে অনেক ছোট এই মানুষ জাতির পৌরুষের কথা। তাই তারাও মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে অন্যদিকে সরে পড়ে।

অনেকেই আশঙ্কা করেছিল এই বুঝি কিলাতের বদলে হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ লাগল। তাহলে অবশ্য হাতীর দলের একটিও আজ রক্ষা পেত না, এবং পীতকেশী যোদ্ধারাও অনেকে আহত-নিহত হত।

যাইহোক হাতী যখন পথছেড়ে ডানদিকের জঙ্গলে পালিয়ে গেল তখন আর্যসেনা আবার ইন্দ্রের স্তুতি করে। ওরা ত ইন্দ্রেরই কাজের জন্য চলেছে, অতএব ইন্দ্র কেন ওদের সহায়তা করবেন না।

এতক্ষণ পর্যন্ত সকলের মনে একই চিন্তা, যেন আরো কিছুক্ষণ দেরি হয় সকাল হতে।

আর্যসেনা বাহিনী অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

চারিদিকে রাত্রির ঝিঁ ঝিঁ শব্দ আর সহস্র সহস্র অশ্বখুরের টপর টপ ধ্বনি। মাঝে মাঝে ঘোড়ার হাঁচির শব্দ একটানা বিরক্তির সৃষ্টি করছে।

হঠাৎ কোথা থেকে বানরের ডাক শোনা যায়।

পথপ্রদর্শক নিষাদ দুই হাত উপরের দিকে তুলে সকলকে দাঁড়াতে সঙ্কেত করে কান খাড়া করে শোনে।

আবার শব্দ। কিছুক্ষণ পর আবার।

—ব্যাপার কি? প্রশ্ন করে কুৎস।

—এটা বানরের ডাক নয়। কিলাত মুখ দিয়ে অমনি শব্দ করে সঙ্কেত করছে।

—নকল করবার অর্থ?

—শত্রুর অগোচরে নিজ পুরীতে সংবাদ পাঠানো। কিন্তু এখন আমরা কিলাত পুরী থেকে এক যোজনেরও কম দূরে রয়েছি। সমগ্র জঙ্গলে মাঝে মাঝে এক একটি গাছের উপর অমনি কিলাত চর রয়েছে। কারো চোখে কোনো বিপদের চিহ্ন পড়লে সে ঐরকম জংলী প্রাণীর শব্দ করে অন্যকে সংকেত করে। খানিক দূরে যে রয়েছে সেও ঐ একই প্রকারে শব্দ করে। এমনি এক পলকে সারা জঙ্গলময় পুঁ পুঁ শব্দ করতে করতে একেবারে শুষ্ণ নগরীতে গিয়ে পৌঁছে যায়। অতএব আমাদের জেনে রাখা দরকার যে কিলাতরা

আমাদের আগমন বার্তা জানতে পেরেছে। এখন ওদের যুদ্ধের জন্য তৈরী দেখতে পাব আমরা।

—একদিক থেকে ভালই হল। বলল কুৎস আর্জুনেয়। শত্রু যদি পালাতেও চায় ত শুষ্ণ নিজের পুরী ছেড়ে নিশ্চয় পালাবে না। নিশ্চয় আমাদের বাধা দেবে। আর আমরাও তাই চাই।

আরো কিছুদূরে যেতে ডানদিকের পূবগগনে উষার রক্তিম আভা দেখা যায়। সকলের মন খুশীতে ভরে ওঠে। নিশাচরের সঙ্গে দিনের আলোয় যুদ্ধ করতে পারার আনন্দ সকলের মনে।

এবার থেকে জঙ্গল কম হয়ে আসছে।

এদিকের গাছগুলি মানুষের হাতে কাটা পড়ে জঙ্গলের ঘনতা কমে গেছে এবং মানুষে চলা পথও তৈরী হয়েছে ইতস্ততঃ।

এই পরিষ্কার জায়গাগুলিতে শত্রুর গরু-ঘোড়া প্রভৃতি পশুরা থাকত। রাত্রের হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত বড় বড় গাছ পুঁতে দুর্গের মত তৈরী করা। কোথাও কোথাও কাঠের বদলে বিরাট বিরাট পাথরের টুকরো এনে রাখা হয়েছে।

এই গড়ের নাম হ'ল পুরী। কিলাত বস্তী।

এই পুরী আবার কয়েকটি পংক্তিতে ভাগ করা।

শত্রুকে প্রত্যেক পংক্তির মুখে বাধা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বাধা অতিক্রম করে যেতে পারলে তবে মূল পুরীতে যাওয়া সম্ভব।

পুরীর কাছাকাছি আসতেই এদিক ওদিক থেকে বাণের সাঁই সাঁই শব্দ কানে আসে।

শুষ্ণ কুৎস বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

এবার পীতকেশীরাও বাণ ছুঁড়তে আরম্ভ করে। তীর-ধনুকে পীতকেশী কিলাতের চেয়ে অনেক বেশি সবল। আর্যসেনার সকল বাণের ফলা তামার তৈরী। আর কিলাতের বাণের ফলা

বেশির ভাগ পাথরের টুকরো বা হাড়ের অংশ দিয়ে তৈরী হত। সেগুলি তামার মত তীক্ষ্ণ হত না। তবে কিলাত-বাণের ফলায় অধিকতর বিষ মাখানো থাকত বলে কোন প্রকারে যদি একটু রক্তের ছোঁয়া লাগত তাহলে তার অবশ্যই প্রাণ যেত।

এমনি কিলাত-বাণের আঘাতে আর্যঘোড়াও নিহত হতে থাকে।

তাছাড়া আর্যসেনার প্রত্যেকের বুকে ছিল তামার তারের কবচ বা বর্ম। যার জন্য শত্রুর আঘাত অনেকাংশে বিফল হতে লাগল এবং ওদের আঘাত প্রায় প্রত্যেকটাই অব্যর্থ কাজ করতে লাগল।

দেখতে দেখতে প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

ঘোড়ায় চড়া মানুষের দেরি হয় না অকুস্থলে পৌছতে। তারপর দুই দলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ।

কুন্ত, অসি, গদার যুদ্ধ। একে অপরকে প্রাণপণ শক্তিতে প্রহার করছে। কারো প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ছে মাটির উপর, কারো বা অর্দ্ধমৃত দেহটা। তখুনিই হয়ত কারো ঘোড়া তাকে মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর্যরা সকলেই ছিল কুন্ত ধারী। ওদের কুন্তগুলিও ছিল ভীষণ তীক্ষ্ণ।

আর অসুরদের গদাগুলিও ছিল খুব কড়া এবং বড় বড় পাথরের। আর্যদের গদা ছিল তামার এবং কয়েক ধার ওয়ালা। এগুলি একাধারে মস্তক চুর্ণ করতে এবং বিচ্ছিন্ন করতে পারে, কিন্তু অসুরদের পাথরের গদা শুধু মস্তক চূর্ণ করতে পারে।

তরবারীতে পীতকেশীরা ছিল অসম্ভব চতুর। এককথায় অস্ত্র-শস্ত্রের বলে পীতকেশীরা অত্যন্ত দৃঢ় ও চতুর ছিল। একেবারে কাছাকাছি আসতে ওরা ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দ্বন্দে অবতীর্ণ হল। কোথাও বা ঘোড়ার পিঠেই চলল প্রচণ্ড রক্তারক্তি।

কুৎসের পরাক্রম দেখবার মত হয়েছিল। তার হাতের তরবারীর

ক্ষিপ্রতা দেখে অতি বড় বীরেরও ভয়ে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কচু গাছের মত শত্রুর মাথা ধড় থেকে আলগা হয়ে জমিতে গিয়ে পড়ছে, আর কুৎস অক্লান্ত গতিতে কাটতে কাটতে এগিয়ে চলেছে।

এতক্ষণে ওরা পুরীর কাঠের দরজার সামনে এসে পৌঁছয়।

তখনো দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি।

শুধু শরীরের গঠন দেখে আর্যরা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। আর্যযোদ্ধার কেউই পুরো পাঁচ হাতের কম লম্বা নয়। আর চার হাত হলেই তারা কিলাত হবে।

সাহসে অসুররা কিলাতের চেয়ে অনেক বেশি।

ওদের যুদ্ধ দেখে মনেই হয় না যে ওরা আঘাতকে আঘাত বলে ভাবে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও যতক্ষণ তার জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ সে ক্রমাগত শত্রুকে আঘাত করছে।

এমনি করে একটি একটি করে পংক্তি দখল করে তবে আর্যদের এগুতে হয়। সর্বশেষ পংক্তিতে সবচেয়ে তুমুল যুদ্ধ হয়। দুই দলের যোদ্ধাদের মধ্যে নিজ নিজ নেতার জয়ধ্বনি ঘোষিত হতে থাকে আর একদল অপর দলকে আক্রমণ করতে থাকে।

শুষ্ণ দূরে দাঁড়িয়ে তার অনুচরদের সঙ্গে পীতকেশীদের যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছিল। শুষ্ণ অপেক্ষা করছিল পীতকেশী সেনাপতির জন্য।

ধীরে ধীরে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে।

এবার দুই সেনাপতি একে অপরের সামনে আসে।

শুষ্ণ তার বন্ধুদের মত আকারে অত বড় না হলেও অদ্ভুত পেশীবহুল তার দেহের গঠন। যতখানি লম্বা ঠিক ততখানি যেন চওড়া। শুষ্ণ-র হাতে বিরাট গদা থেকে কুৎসের সাথীদের আশঙ্কা হয় ওর একটা আঘাতে কুৎসের দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

শুষ্ণ আর কুৎস আর্জুনেয়কে পাশাপাশি গদাযুদ্ধ করতে দেখে হঠাৎ বলা কঠিন আজ এই যুদ্ধে কে বেঁচে থাকবে। কুৎসের শরীর

লম্বা হলেও মাংসপেশী অনেক কম। গদা চালনায় কেউই কম যায় না। উভয়ে সমানভাবে প্রহার করে চলেছে আর নিজেকে বাঁচিয়ে আঘাত ব্যর্থ করছে। এতক্ষণে কুৎস খুব শৌর্যের পরিচয় দেয়। শুষ্ণ ভীষণ জোরে আঘাত করে কুৎসকে। কুৎস বিদ্যুৎগতিতে পাশ কেটে সরে গিয়ে শুষ্ণর হাত তুলবার আগেই শুষ্ণকে তার তামার গদা দিয়ে আঘাত করে।

শুষ্ণ'র শরীর ছিল হলুদ বর্ণের। সেই দেহের উপর এক একটা গদার আঘাত পড়তে পড়তে ক্রমশঃ সোনার রং হয়ে যায়।

কুৎস প্রতিবার প্রাণপনে আঘাত করতে থাকে এবং তার গদা যখন শুষ্ণ'র শরীরে লেগে লাফিয়ে ফিরে আসে কুৎস ভাবে আজ একমাত্র ইন্দ্রের সহায়তা ছাড়া শুষ্ণকে বধ করা অসম্ভব।

ঠিক সেই সময়ে কুৎস দেখল একজন সুবর্ণ বর্ণ পুরুষ তার পাশে দাঁড়িয়ে শুষ্ণ'র সকল আঘাত ব্যর্থ করে দিচ্ছে। কুৎসের উৎসাহ বেড়ে যায়। হঠাৎ সেই পুরুষের আঘাত রুখতে গিয়ে শুষ্ণ'র গদা ভেঙ্গে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কুৎসের গদা শুষ্ণ'র মাথায় লাগতে শুষ্ণ ছিন্নতরুর মত গড়িয়ে পড়ে যায় এবং পর পর কয়েকটি আঘাতেই শুষ্ণের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।

শুষ্ণ'কে পড়ে যেতে দেখে আর্যসেনার মধ্যে হর্ষধ্বনি হয়। কিন্তু আনন্দ করবার সময় এখন নয়।

এবার শুষ্ণের স্থান গ্রহণ করে কুয়ব।

কুয়ব আর অশুষ দুজনেই দেখতে এবং শক্তিতে শুষ্ণ'র মত।

কুৎস নতুন উদ্যমে শত্রুবধ করে চলেছে। এতটুকু ক্লান্তি নেই তার।

ততক্ষণে ঋজিশ্বা এবং অন্যান্য আর্যশূরিরা এসে কুৎসের জায়গা দখল করে একসঙ্গে আক্রমণ করে অসুর সেনাপতিদ্বয়কে।

কুয়ব আর অশুষ যত বড় বীরই হোক না কেন মাত্র দুইজনের

উপর একসঙ্গে দশ-বারো জন আর্য মহাশূর ঝাঁপিয়ে পড়াতে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

তবুও যতক্ষণ ওরা মাত্র দুইজনে বারোজনের বিরুদ্ধে যুঝেছিল তা আর্যসুরিদের কল্পনার বাইরে ছিল।

মধ্যাহ্নের পূর্বেই শত্রুসেনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

পুরীক্ষেত্রে হতাহতের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। চারিদিকে শুধু মানুষের দেহ স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

রক্তের স্রোত গড়িয়ে চলেছে সেই স্তূপীকৃত মড়ার ভিতর দিয়ে।

সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

ইন্দ্রের সহায়তা সত্ত্বেও আর্যদের যথেষ্ট সেনা ক্ষতি হয়েছে।

অসুর সেনা যারা ততক্ষণে রক্ষা পেয়েছিল তারা পুরী ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর্যরা কিছুক্ষণ তাদের পিছনে তাড়া করে ফিরে আসে।

অসুর পুরীর মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে ব্যস্ত হ'ল কিছু সেনা। কিছু আহতদের ব্যবস্থা করতে লাগল। আর নেহাত যারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তারা বিশ্রাম করবার জন্য তরবারী কোষবদ্ধ করে বসে পড়ে।

শুষ্ণ পুরীতে অনেক পশুধন পাওয়া গেল। এত পশুর জন্যেই ওরা শীতের কটা মাস এই নিচেয় এসে বাস করতে বাধ্য হত।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে।

দিনেরও প্রায় শেষ।

এখনো পশুরা তাদের বেড়া থেকে ছাড়া পায়নি। ওদের দিকে আজ আর নজর দেবার কেউ নেই। সকল পুরুষরা যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রীরাও তাদের সাহায্য করেছিল। আর শিশুরা সেই প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে রয়েছে।

এমন সময় পীতকেশীদের গর্গরা নামক বাজনা বেজে ওঠে।

তার অর্থ বিজয় ঘোষণা।

এখনো শত্রুরাজ কুলীতর-এর পুত্র দুর্দান্ত শম্বর জীবিত রয়েছে। যতক্ষণ শম্বর জীবিত রয়েছে ততক্ষণ তার সঙ্গে অনেক দুর্দান্ত অসুর বীরও জীবিত রয়েছে।

তবুও অসুর শক্তি যত প্রবলই হোক না কেন সপ্তসিন্ধুর মিলিত লক্ষ লক্ষ আর্যের কাছে তারা নিতান্ত নগণ্য।

## ॥ বারো ॥

"দিবে দিবে সদৃশীরণ্যমর্দ্ধ অসেধদপ সদ্মনো জাঃ
অহন্দাসা বৃষভোব বস্নয়ন্তোদব্রজে বর্চিনা শম্বরঞ্চ।"

[ ঋক্ ৬।৩১।৪ ]

শীতের দিনে চরিষ্ণু পুরী পর্বত সানুদেশে ছড়িয়ে থাকে। আর্যদের কাছে এই সব পুরীগুলি শেষ করা সবচেয়ে আগে দরকার।

যুদ্ধে বিরক্তির অর্থ হ'ল শত্রুর দৃষ্টিতে পরাজয় স্বীকার করা। তাই ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে অসুররা আর্যসুরিদের লুঠ করতে আসত।

দিবোদাস যখন প্রথম অসুরদের বিরুদ্ধে সজ্ঘর্ষ শুরু করে তখন তার বয়স ছিল বাইশ বৎসর। আর যখন শম্বরকে বধ করে অসুরদের উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করে তখন তার বয়স ষাট।

জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর একটানা যুদ্ধ করেছে দিবোদাস।

শম্বরের বয়সও প্রায় দিবোদাসের সমান ছিল।

কিন্তু দিবোদাসের জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল শম্বরকে বধ করা।

এবারের শীতে আর্য সেনাপতি ঋজিশ্বা তিন মহাসুরের বিরুদ্ধে নিজ শৌর্য প্রদর্শন করবার সুযোগ পেল।

এই মহাসুরদের নাম পিপ্রু, বংগৃদ, করঞ্জ।

পিপ্রু প্রভৃতি অসুরের সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার অসুরসেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু আর্যের মহাশক্তির কাছে অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাদের পরাজয়-স্বীকার করতে হ'ল। আর্যসেনা তাদের পুরী দখল করে সমস্ত ধ্বংস করে দেয়।

কোলিতর শম্বরকে যদিও সমস্ত অসুর পুরীর মহানায়ক বলা হয় তবুও নিরানব্বুইটা অসুর পুরীর নিরানব্বুই জন নায়ক ছিল যারা এক একজন শুশ্ন'র মত মহাবীর।

শুষ্ণ'র মৃত্যুর পর আর্যরা ভেবেছিল অন্যান্য অসুর নায়করা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তাদের সে ধারনা ভুল প্রমাণিত হ'ল।

শুষ্ণ'র মৃত্যুর পর অন্যান্য অসুর নায়করা দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের পরাজয়ের মূল্য আদায় করতে থাকে।

বৃহৎ পর্বতের নিচেকার ছোট ছোড় পাহাড়গুলির মধ্যে পুরী-পত্তন করবার অনেক সুবিধা ছিল। তাই যেখানেই অসুররা একটু সুবিধা পেয়েছে সেখানেই মোটা মোটা পাথরের দেয়ালের বাড়ী তৈরী করে অসুর পুরী পত্তন করেছে।

যদিও অসুরদের মূখ্য শত্রু ছিল আর্যজাতি, তবুও পণি (প্রাগ দ্রাবিড়) এবং নিষাদ (ভীল প্রভৃতি অত্যন্ত কালো বর্ণের জাতি) দের উপরেও তাদের ক্রোধের সীমা ছিল না। তার কারণ নিষাদ আর পণি এরা আর্যদের সহায়তা করত বটে তবে আর্যদের প্রেমপাত্র হতে পারেনি। এই দুই জাতিকেও আর্যরা তাদের পশুর চেয়ে অধিক সুনজরে দেখত না। তবে অসুরদের সম্পত্তি লুঠ করলে ওদের একটা ভাগ দেওয়া হত। তাই পণি-আর নিষাদরা আর্যদের কাজে তেমনি মাথা নিচু করে থাকত, যেমন সিংহের সামনে শিয়াল লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়িয়ে থাকে।

নিষাদ জাতিও ছিল অসুরদের মত বনচর। কিন্তু দুই জাতির স্বভাবের মধ্যে ছিল আকাশ পাতাল প্রভেদ।

কিলাত অসুর নিজেদের আর্যজাতির চেয়ে কোন অংশে দুর্বল মনে করত না। এরাই সর্বপ্রথম বৃহৎ পর্বত এবং স্থলারণ্যের প্রকৃত স্বামী ছিল।

পুরো একটি বৎসর যাবত ছোট খাটো সজ্ঘর্ষ লেগে রইল।

এবারের যুদ্ধ যদিও পিপু, মৃগয়ু, অশুষ, পর্ণয় প্রভৃতির সঙ্গে হচ্ছিল তবুও মনে হচ্ছিল যেন সব জায়গায় শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে।

যেখানে বিপদের সম্ভাবনা বেশী হয়ে দেখা দিত শম্বর সেইখানে পৌঁছে যেত। তেমনি কুৎস আর্জুনেয়, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু, শ্রুতর্য, তুম্বিতী, দভীতি, ধ্বসন্তি, পুরুষন্তি প্রভৃতি আর্য কুমাররা বিপদের গুরুত্ব বুঝে সেই সব ঘাঁটিতে গিয়ে উপস্থিত হত। কিন্তু ওদের সাহায্য করবার জন্য বাছাই করা সেনাবাহিনী নিয়ে দিবোদাস স্বয়ং সর্বদা প্রস্তুত থাকত এবং ঘোড়ার সাহায্যে অতি অল্প সময়ে ঘাঁটিতে পৌঁছে যেত।

কঠোর পরিশ্রম করে, বিস্তর ক্ষতিসহ্য করে আর্যসেনা সমতল ভূমির অরণ্যপ্রদেশ থেকে অসুরদের তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হ'ল।

এবার অসুররা পর্বত দুর্গের আশ্রয়ে গিয়ে উঠল। এই দুর্গ জয় করা অত্যন্ত কঠিন। দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য এই সব দুর্গ কোথায় কতগুলি আছে তা আর্যরা বহুচেষ্টা করেও জানতে পারেনি। উপরন্তু এই সব অঞ্চলে ঘোড়া একেবারেই অচল।

তাই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত একশটা দুর্গ জয় করা এমন কিছু বিচিত্র নয়।

এবার শেষ যুদ্ধ হল উদব্রজ নামক স্থানে। এই অজেয় জায়গাটা শম্বর বহুদিন যাবত ব্যবহার করছিল। উদ অর্থাৎ জল, ব্রজ অর্থে গোষ্ঠ। জলের উপর তৈরী করেছিল এই অভেদ্য বাসস্থান।

এই দুর্গ খুব সম্ভবতঃ বর্তমান কাংড়া ( কাঙ্গড়া ) নামক স্থানের দুর্গ, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত অজেয় ছিল। এই দুর্গ নেপালের কাছ থেকে রণজিৎসিংকে অধিকার করতে অকথ্য পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

রণজিৎ সিংহের পর ইংরেজদেরও বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল এই দুর্গে অধিকার স্থাপন করতে।

এই দুর্গে মানুষ এবং পশুর জলপানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মানুষ ও পশুর জন্যে একাধিক বৎসরের মত ভোজন সামগ্রী জমা করে রাখার ব্যবস্থা ছিল।

এই দুর্গ আক্রমণ করতে হলে আক্রমণকারীকে একটা দুরারোহ পর্বতের উপর চড়তে হত এবং তখন দুর্গ রক্ষীরা উপর থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়ে আক্রমণকারীকে অনায়াসে ধ্বংস করতে পারত।

পরে এই দুর্গ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ শোনা যায়। কেউ কেউ বলে ঐ দুর্গটা ছিল জলন্ধর রাক্ষসের। এই জলন্ধর রাক্ষসকে ইন্দ্র স্বয়ং নিধন করবার পর সমগ্র জলন্ধর ভূমি দস্যুকবল থেকে মুক্ত হয়।

এই জলন্ধর আর কেউ নয় দুর্দান্ত কিরাতরাজ শম্বর। তাকেই রাক্ষসরূপে কল্পনা করা হয়েছে পরবর্তী যুগে।

দুর্গের কাছে বিরাট পাষাণপুরী শম্বর সেনায় ভর্তি ছিল এবং তারা এখান থেকে বহুদিন যাবত আর্যজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে।

অসুর সেনাপতি বর্চি ছিল শম্বরের ডান হাত।

নিরানব্বুইটি অসুর পুরী জয় করতে আর্যজাতিকে যতখানি কষ্ট করতে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হয়েছিল এই উদব্রজ দুর্গ অধিকার করতে।

এই উদব্রজ দুর্গই ছিল অসুর রাজের শেষ দুর্গ। এখানকার একশ হাজার সৈন্যের যুদ্ধের কাহিনীই প্রমাণ করে যে এই যুদ্ধ কত ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল।

* * *

মহাসঙ্কটের দিনেও শম্বরকে কখনো এতটুকু বিচলিত হতে দেখা যায়নি। তার বড় বড় বীর যোদ্ধা এবং সেনানী হাজার হাজার

সংখ্যায় যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে শম্বরের চোখের সামনে। তাই মাঝে মাঝে তাদের সেই চেহারা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কখনো শুষ্ণ'র বীরত্বের এক একটি দৃশ্য ভেসে উঠত শম্বরের চোখের সামনে। কখনো বা তার বাল্যমিত্র কুয়বের চিত্র ভেসে উঠত মানসপটে।

সেদিন সেনাপতি বর্চির সঙ্গে যুদ্ধের মন্ত্রণা করবার সময়ে শম্বর বলল,—আমাদের প্রত্যেক বীর যে রকম অসম্ভব বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রাণ দিয়েছে তাতে আমার মনে হয় বিজয় খুব বেশি দূরে নয়। এই যে দেখছ এতবড় দেশ, এতবড় জাতি—এই যোজনের পর যোজন ভূমির উপর যুদ্ধ হয়, আসলে জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় মাত্র এক আঙ্গুল জায়গার উপর। তাই আমারও মনে হয় আমাদের জয়-পরাজয় শেষ মুহূর্তে ঐ মাত্র কয়েক আঙ্গুলের পার্থক্যে নির্দ্ধারিত হবে।

—আমারও তাই মত। যতগুলি সঙ্ঘর্ষ দেখলাম সবই ঐ সামান্য পার্থক্য থাকতে নিষ্পত্তি হতে দেখেছি। তাছাড়া আর্যজাতি যে একের পর এক জয়লাভ করছে ওরা বলে সে নাকি তাদের বড় দেবতা ইন্দ্রের হাত।

—ইন্দ্র-মিন্দ্র কারো হাত নয়। আমাদের অসুর যুদ্ধ করতে পীতকেশীদের চেয়ে কম নয়। কি যেন নাম সেই পীতকেশ সেনাপতির ?

—কুৎস !

—হ্যাঁ, কুৎস আর শুষ্ণ'র মধ্যে দৈহিক শক্তির পার্থক্য ছিল অনেক বেশি। আমাদের শুষ্ণ'র হাতের বিশাল গদা যদি একবার কুৎসের মাথায় পড়ত তাহলে এক আঘাতেই তার ইহলীলা শেষ

হয়ে যেত। আর কুৎসের পতন হলেই তার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণ নিয়ে নিচেয় পালিয়ে যেত।

—তা ঠিক, কিন্তু কুৎসের শরীর অত্যন্ত হাল্কা বলে শুষ্ণ'র গদার আঘাত আসতে দেখে বিদ্যুতের বেগে পাশ কেটে যেত।

—তাহলেই বুঝতে পারছ ঐ সামান্য অবসরটুকুর মধ্যেই জয়-পরাজয় নির্ণয় হয়ে গেল।

—ঠিক বলেছ বর্চি! একদিন আমার গদাও দিবোদাসের মাথার উপর তেমনি ভাবে গিয়ে আঘাত করবে। যদি দিবোদাস পালিয়ে না যায় তাহলে ওদের ইন্দ্রও সেই আঘাত থেকে ওকে রক্ষা করতে পারবে না।

পীতকেশীরা বহু অসুর পুরী ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দিয়েছে এবং ক্রমশঃ তাদের সাহস বেড়েই চলেছে। অসুরদের সঙ্ঘর্ষ কম বলে তাদের উৎসাহ বাড়েনি, একের পর এক সফলতাই উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। যাতে পীতকেশ যোদ্ধা কম না পড়ে সে ভার ঋষি ভরদ্বাজ নিজের হাতে নিয়েছেন।

ইন্দ্র ঋষির মারফত সমগ্র সপ্তসিন্ধুতে সংবাদ পাঠিয়েছেন,—শম্বর হত্যা সমীপবর্তী এবং অসুর বিজয় নিশ্চিত। এমন অবসর বার বার পাওয়া যাবে না, অতএব প্রত্যেক আর্যের মধ্যে যে পৌরুষের রক্ত বইছে তা দেবাসুর সংগ্রামে প্রকাশ করতে হবে।

এর পরই সারা সপ্তসিন্ধুর লোক নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে ছুটে এসে আর্যবাহিনীর দলভুক্ত হয়েছে। এদের সংখ্যা এত অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তাদের একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

এরপর যখন অসুর পুরীর বেশির ভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন সকলকে উদব্রজে পাঠানো হতে থাকল।

অসুররাও তাদের সর্বস্ব বাজী রেখে যুদ্ধ করতে লাগল। তাদের পংক্তিও শূন্য হতে পারত না এমন ভাবে তারা প্রস্তুত হয়েছিল।

* * * *

বর্চী একশ হাজার অসুর সেনা নিয়ে একই জায়গায় থেকে দৃঢ়ভাবে পীতকেশ সেনাকে বাধা দিতে লাগল।

দিবোদাস স্বয়ং এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল। দিনের পর দিন কাতারে কাতারে অসুর সংহার হতে লাগল।

আর্যদের কাছে ছিল তামার অস্ত্র। যা অসুরদের কাছে তেমন ছিল না। পণিরা আর্যদের জয় নিশ্চিত বলে জানত। অসুরদের ভয়ে তাদের কাছে অস্ত্র নিয়ে যেত না বলে অসুররা তামার তৈরী অস্ত্রের বলে তেমন বলীয়ান ছিল না। যা কিছু ছিল তা প্রায়ই পাথরের তৈরী।

শম্বর বলেছে,—মরা বাঁচা দুইই আমাদের হাতের সামনে রয়েছে। পরাজয় দেখবার জন্য আমি বেঁচে থাকব না। যতক্ষণ আমরা বেঁচে থাকব, ততক্ষণ বীর জাতির মত বেঁচে থাকব।

দিনের পর দিন অসুর সংখ্যা কমে আসতে লাগল। যুদ্ধের সংবাদ প্রতিদিনই শম্বরের কাছে পৌঁছত। কিন্তু কুলিতর পুত্রের হৃদয় ছিল বজ্রের মত কঠিন। কখনোই তার দৃঢ়তা এতটুকু শিথিল হতে দেখা যায়নি। অবশ্য সেই গুণ সকল অসুরের মধ্যে ছিল।

যুদ্ধের ভাব দেখে সকলে মনে মনে ভাবছিল এ যুদ্ধে মানুষ নয়, দেবতা যেন মানুষের উপর ভর করে যুদ্ধ করছে।

অবশেষে শম্বর সমস্ত পাহাড়ী জলধারা বিষ ঢেলে নষ্ট করে দিল এবং যতগুলি জলের কুণ্ড ছিল তা সব শুকিয়ে ফেলল। আর্যসেনা বিষের ভয়ে জলপান করত না। অত্যন্ত পিপাসার সময় বাধ্য হয়ে এক ঢোক জল পান করেই চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়েছে অনেক আর্যসেনা। তাছাড়া ভীষণ চড়াই উৎরাই করবার সময় তৃষ্ণায় ছাতি

ফেটে যায় তবুও প্রাণের ভয়ে এক ফোটা জল কেউ মুখে দেয় না। কত আর্য জলের অভাবে ছটফট করে পাহাড়ের নিচেয় চিরদিনের মত গড়িয়ে পড়েছে তার ইয়ত্বা নেই।

কিন্তু ইন্দ্র, বরুন, সোম সকল দেবতারা সর্বদা আর্যসেনার মাথার উপর ভর করে তাদের যুদ্ধে প্রোৎসাহ দিতেন।

মুহুর্মূহু ধ্বনিত হতে থাকে, বিজয় আর দূরে নেই, এগিয়ে চল।

দেবতাদের দ্বারা জোর করে আর্যসেনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

প্রত্যেকটি পাথরের পিছনে, প্রত্যেকটি শিলার আড়ালে ধনুর্বাণ হাতে কৃতান্তের মত অপেক্ষা করছে অসুর।

প্রতিপদক্ষেপে কেউ না কেউ আর্য লুটিয়ে পড়ছিল।

তবুও আর্যসেনা এগিয়ে চলেছে।

অবশেষে আর্যসেনা পাহাড়ের ওপাশে খানিকটা নিচু অধিত্যকা অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছল। দিবোদাস জানত আর একটু দেরি হলেই অসুরদের নিশাচরী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আরো কিছু দূরে পাথরের দরজা দেখতে পাওয়া গেল। এখানে পংক্তির পর পংক্তি অসুর সেনা প্রস্তুত হয়ে আছে।

দিবোদাস সেইদিকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হাজারে হাজারে আর্যসেনা তাকে অনুসরণ করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই সাধারণ দরজার সামনে অসুরদের লাশ এত উঁচু হয়ে গেল যে দরজা ঢাকা পড়ে যায়। একজনও অসুর মারা পড়লে তখুনিই আর একজন এসে তার জায়গা দখল করে যুদ্ধ করতে থাকে।

তারপর একটা গুহা পাওয়া গেল। আর্যরা সন্দেহ করেছিল এখানে অসুর সেনা খুব বেশি হবে না।

দিবোদাস চীৎকার করে বলল,—কুলিতর পুত্র, সত্যিই তুই

কাপুরুষ। তোর সবচেয়ে বড় শত্রু আমি দিবোদাস এখানে তোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। যদি শক্তি থাকে ত এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে লড়াই কর। আয় আজ আমাদের দুজনের মধ্যে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হোক।

মেঘ গম্ভীর স্বরে দিবোদাস অনেক কিছু বলতে লাগল, তার এক বর্ণও কুলিতর পুত্রের বোধগম্য হল না। কিন্তু দিবোদাসের কর্কশ স্বরে কুলিতর পুত্র অনুমান করে দিবোদাস কি বলছে।

হঠাৎ দেখা গেল বিশাল গদা হাতে শম্বর কি সব বলতে বলতে দিবোদাসের দিকে এগিয়ে আসছে।

দিবোদাস তৈরী ছিল।

দুজনের মধ্যে এবার প্রচণ্ড গদাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

দুজনেই ঠিক বেছে বেছে অরক্ষিত অঙ্গের উপর গদার প্রহার করতে থাকে। কিন্তু দুজনেই ঠিক সুযোগ মত পাশ কাটিয়ে প্রহার ব্যর্থ করে দেয়।

এখন দিনের আলোতে দুজনের শরীর দেখা যাচ্ছিল।

দিবোদাসের দেহ অত্যন্ত গৌরবর্ণ, মাথায় অত্যধিক পীত কেশরাশি। হাতে তামার তৈরী বিশাল বজ্র তার বিশালকায় স্বাস্থ্যের অনুরূপই ছিল।

কিলাতরাজ লম্বায় দিবোদাসের চেয়ে সামান্য একটু ছোট হলেও তার দীপ্ত মুখের দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

কিলাতরাজের চেহারায় কোথাও এতটুকু মৃত্যুর ছায়ার স্পর্শ নেই, বরং বিজয়ের উল্লাস প্রতি অঙ্গে যেন নৃত্য করছে।

চারিদিক থেকে পীতকেশ আর অসুর যোদ্ধা গোল করে ঘেরা বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে দুই মহাশূর গদার লড়াই করছে।

ঐ দুজনের যে কোনো একজনের পরাজয়ে একটি জাতি পরাজয় স্বীকার করবে। এখুনিই জয় পরাজয় নিশ্চিত হবে।

সকলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে আর যুদ্ধ দেখছে।

এমন পৌরুষতাপূর্ণ যুদ্ধ কেউ কখনো দেখেনি।

দিবোদাস বরাবর বলত, এমন সমানে সমানে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে মরেও আনন্দ আছে।

তাই আজ শেষ যুদ্ধে কুলিতর পুত্র আর বভ্রযশ্ব-পুত্রের মধ্যে মরণ বাঁচন লড়াই চলছে। আজই ইন্দ্রের সঙ্কল্প পূর্ণ হবে।

উপস্থিত সকলের দৃষ্টি এই দুই বীরের শরীরের উপর নিবদ্ধ রয়েছে। কুলিতর পুত্র তার বিশাল গদা দিয়ে বার বার দিবোদাসের মাথায় আঘাত করছে, আর দিবোদাস অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বার বার সে আঘাত কাটিয়ে যাচ্ছে।

শম্বরও ঠিক তেমনি ভাবে দিবোদাসের আঘাত থেকে নিজের মাথা বাঁচিয়ে নিয়ে পুনর্বার আঘাত করছে।

দিবোদাস পর পর একই জায়গায় অর্থাৎ মাথায় আঘাত করছিল, তাই শম্বরের লক্ষ্য ছিল তার নিজের মাথার দিকে।

হঠাৎ দিবোদাসের বজ্র শম্বরের বুকের উপর পড়ল প্রচণ্ড বেগে।

একই আঘাতে শম্বর মাটিতে পড়ে যায়।

মনে হ'ল আঘাতটা ঠিক মর্মস্থলে লেগেছে।

শম্বরকে পড়ে যেতে দেখে সকল পীতকেশী আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। শম্বর এক মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ে যায়।

সেই মুহূর্তে আর্যসেনা বিপুলবেগে কিলাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বর্চিও শম্বরের শত্রুর সঙ্গে প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এল।

কুৎস বর্চিকে মাঝপথে বাধা দিতে চেষ্টা করলে দিবোদাস চীৎকার করে ওঠে,—ওকেও আসতে দাও আমার কাছে।

অতঃপর বর্চির সঙ্গেও দিবোদাসের গদাযুদ্ধ শুরু হয়। দিবোদাস বর্চিকে এক পলকের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে সুযোগ দেয়নি।

সন্ধ্যা হতে হতে দিবোদাসের বজ্র বর্চির বুকের ঠিক সেই জায়গায় আঘাত করল যেখানে কিছুক্ষণ আগে শম্বরকে মেরেছিল।

সেই আঘাতে কিরাত সেনাপতি দুর্ধর্ষ বর্চিও তার প্রভু শম্বরের পাশে গড়িয়ে পড়ল আর উঠল না।

* * *

এমনি করে চল্লিশ বৎসর পর শম্বর আর দিবোদাসের যুদ্ধ শেষ যবনিকা টেনে দিল।

অসুর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল।

তবুও আর্যসেনা যাকে সামনে পেল তাকেই হত্যা করতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে হিমালয়ের নিম্নাঞ্চল অসুর শূন্য হয়ে গেল।

এই প্রচণ্ড শীতের দিনেও তারা বহু উপরে গিয়ে বাস করবার ব্যবস্থা করল। সেখানে শুধু চামড়া আর আগুণ দিয়েই ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে লাগল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

আর্যসেনা নিজ নিজ ভূমির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

সমগ্র সপ্তসিন্ধুর জনতা দিবোদাসের ছত্রছায়ায় মাথা নিচু করে।

একটি যুগে শেষ হয়ে আর একটি নতুন যুগের সূচনার ইঙ্গিত দিকে দিকে।

-শেষ—